আনন্দমেলা



২৬ মার্চ ১৯৮০
১
আনন্দবাজার-প্রকাশন



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি দিয়েছেন - শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, সোমনাথ দাসগুপ্ত

স্ক্যান করেছেন - সঙ্ঘামিত্রা সরকার

এডিট করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার স্পেশাল ইস্যু থাকে
এবং আপনি যদি আমাদের সাথে সেগুলি সংরক্ষণে সাহায্য করতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com



ঝরঝরে তরতাজা হ'য়ে উঠুন
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরল—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল...
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান
লেবুর মত চনমনে তরতাজা
লিনটাস-LR.27.203 BG
হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আনন্দমেলা

১২ চৈত্র ১৩৮৬ • ২৬ মার্চ ১৯৮০ • ৫ বর্ষ • ২২ সংখ্যা

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা



অলিম্পিকের তোড়জোড়

চিরঞ্জীব

জুলাইয়ের উনিশ তারিখে অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন হবে সোভিয়েট ইউনিয়নের রাজধানী মস্কোয়। এই অলিম্পিক ঘিরে সারা রাশিয়ায় এখন থেকেই দারুণ হৈ-চৈ।



অলিম্পিক-বিখ্যাত চেক দৌড়বাজ জাটোপেক

সম্প্রতি রাশিয়ার কয়েকটি শহরে গিয়েছিলাম। ওদের তোড়জোড় দেখে মনে হচ্ছিল, দু'-একদিন পরেই বোধহয় অলিম্পিক গেমস শুরু হবে। দশ বা বারো বছরের ছেলেমেয়ে হোক, কিংবা সত্তর বা আশি বছরের বৃদ্ধ হোন, সকলেই যেন মস্কো অলিম্পিক নিয়ে ব্যস্ত। তা বলে অবশ্য কেউ নিজের কাজে ফাঁকি দিচ্ছেন না।

অলিম্পিকের আয়োজনে ব্যস্ত হাজার-হাজার কর্মী। ১৯ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত ১৬ দিনে অলিম্পিকের কাজের জন্য দরকার হবে ১ লক্ষ ৫০ হাজার কর্মীর। ও'রা এখন ট্রেনিং নিচ্ছেন।

রাশিয়ায় রুশী ছাড়া অন্য কোনো ভাষার বিশেষ চল নেই। কিন্তু এই অলিম্পিকে যাবেন পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার হাজার-হাজার মানুষ। তাঁদের মধ্যে আছেন খেলোয়াড়, বা প্রতিনিধি এবং দর্শক। কারও যাতে ওদেশে গিয়ে ভাষার সমস্যায় পড়তে না হয়, সে-জন্যে কয়েক হাজার তরুণ-তরুণী এখন নানা ভাষা শিখছেন। শিখছেন ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ—এমন-কী হিন্দিও। দেখলাম, বাংলাও শিখছেন কেউ কেউ। যাঁরা ভাষা শিখছেন তাঁদের মধ্যে যেমন আছেন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, তেমনি আছেন শিক্ষক, হোটেল-কর্মী এবং ট্যাক্সি-চালক।

অলিম্পিককে বলা হয় 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'। এত বড় অনুষ্ঠান নাকি পৃথিবীতে আর একটিও হয় না। এত মানুষ কোনো অনুষ্ঠানে জড়ো হন না।

এমনিতেই মস্কো শহরে ভীষণ ভিড়। আমাদের কলকাতার মতো ট্রামে-বাসে ঠাসা-ঠাসি। শুধু ঝুলতে দেখিনি কাউকে। ঝোলার উপায়ও নেই অবশ্য। কেননা ট্রাম-বাস স্টার্ট নেওয়ার আগেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ভিড় মেট্রো রেলেও ভীষণ। এর উপর অলিম্পিক ঘিরে বাড়তি মানুষ হাজার-হাজার। শুধু প্রতিযোগীর সংখ্যাই ১২,৭০০। অলিম্পিক ভিলেজে এ'রা থাকবেন, খাবেন। যাতায়াত করবেন ক্রীড়া-কেন্দ্রে। এর ওপর আছেন প্রতিনিধি ও সাংবাদিক। তাঁদের সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি। দর্শক লক্ষ-লক্ষ। সেকালে বোধহয় রাজসূয় যজ্ঞও এমনভাবে হত না।

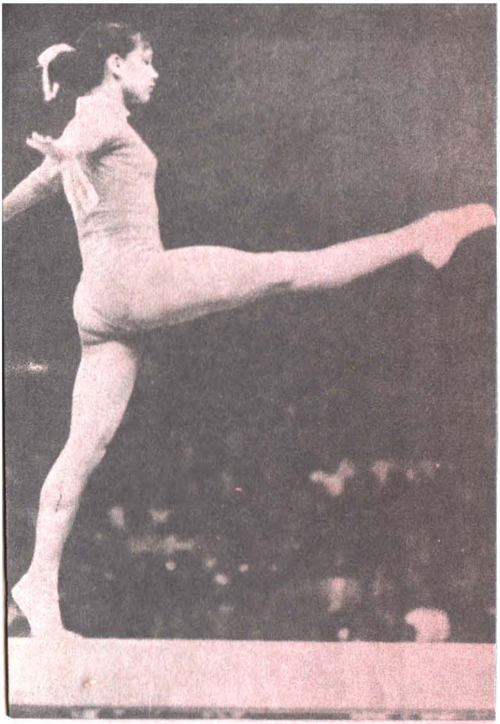
যে ক'দিন আমি রাশিয়ায় ছিলাম, ওদের খাবার খেতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু সকলের তো ওসব পছন্দ হবে না। অলিম্পিক-উদ্যোক্তারা তাই পাঁচশো রকমের খাবার রান্নার ব্যবস্থা করেছেন। প্রতিদিন নতুন-নতুন খাদ্য পরিবেশণ করা হবে অতিথিদের।

অলিম্পিক শুরু হলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী স্বেচ্ছাসেবকের কাজ নেবেন। তা বলে এখন তাঁরা বসে নেই। ওদেশে এক রবিবারে দেখলাম, স্টেডিয়াম সংস্কার বা নতুন স্টেডিয়াম তৈরির কাজে দলে-দলে ছাত্রছাত্রী অংশ নিচ্ছেন। সবচেয়ে বেশি সাহায্য করছেন এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের ছাত্ররা। যাঁরা সক্রিয় অংশ নিতে পারছেন না, তাঁরা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে সপ্তাহে দুই বা তিন রুবল



মস্কো অলিম্পিক গেম্‌স-এর প্রতীক





বিমের উপর জিমন্যাস্ট নেলি কিম

(ওদের মুদ্রা) পাঠিয়ে দিচ্ছেন অলিম্পিক কমিটির কাছে।

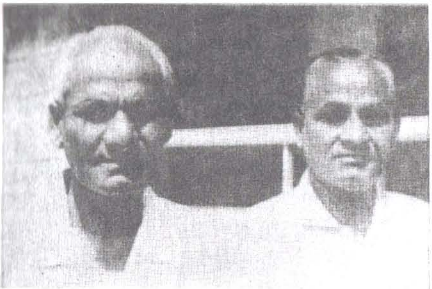
অলিম্পিকে খরচা হবে প্রায় আড়াই শো কোটি রুবল। বিশাল বাজেটের তুলনায় ওই অর্থ সাহায্য যৎসামান্য। উদ্যোক্তাদের নিষেধ সত্ত্বেও নিচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা টাকা-পয়সা পাঠানো অব্যাহত রেখেছে। এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের ছাত্ররা কাজের বদলে টাকা-পয়সা নিচ্ছেন না।

ডিসেম্বরে প্রচণ্ড শীত। মস্কো শহরে কোনো গাছে পাতা নেই। রাস্তাঘাট বরফে ঢাকা। ভোলগা ও মস্কো নদীর জল জমে বরফ হয়ে গেছে। স্টীমার, মোটর-লঞ্চ, জাহাজ কিছুই চলতে পারছে না। তা বলে অলিম্পিকের কোনো কাজ আটকে নেই।

আমরা সবাই বলছি 'মস্কো অলিম্পিক'। আক্ষরিক অর্থে তা কিন্তু ঠিক নয়। মস্কো শহরের বাইরে অন্য শহরেও এবার অলিম্পিকের খেলা হবে। ফুটবলের তিনটে গ্রুপের কোয়ার্টার-ফাইনাল পর্যন্ত ম্যাচ হবে কিয়েভ, মিনস্ক ও লেনিনগ্রাদে। আর একটি গ্রুপের গোড়া থেকে শেষ মস্কোয়। তবে ফুটবলের ওই তিন গ্রুপের পরের সব ম্যাচ

লেনিন স্টেডিয়াম (আসন-সংখ্যা এক লক্ষ)





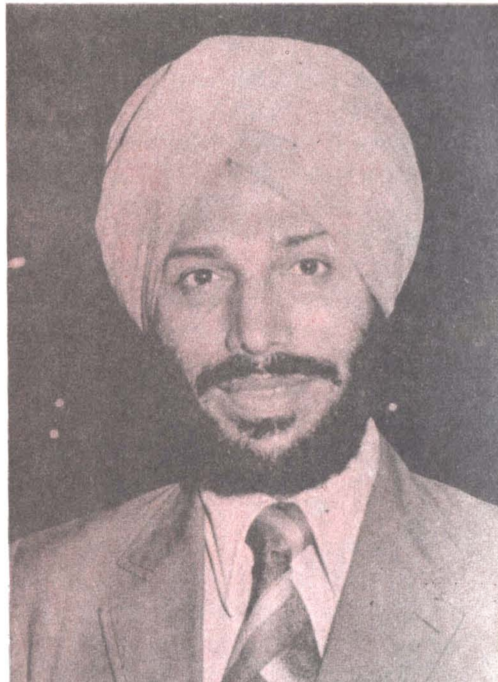
হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ ও রূপসিং

হবে মস্কোয়। আরও একটি বিষয়ের প্রতি-যোগিতা হবে অন্য একটি শহরে। পালতোলা নৌ-বাইচ (ইয়টিং) প্রতিযোগিতার শুরু থেকে ফাইনাল পর্যন্ত হবে বাল্টিক সাগর-তীরের শহর তাল্লিনে।

লেনিনগ্রাদে দেখলাম কিরভ স্টেডিয়ামটির সংস্কার হয়েছে, আসন বাড়ানো হয়েছে। ওখানে ১ লক্ষ লোক বসে ফুটবল দেখবেন। মস্কো শহরে লুঝনিকি কমপ্লেক্সের তুলনা হয় না। কিন্তু তাল্লিনে সাগর - তীরের গ্যালারিতে বসে দশ হাজার দর্শক যখন শত-শত পালতোলা নৌকোকে সমুদ্রের বুক চিরে তীরবেগে ছুটে আসতে দেখবেন, তখন সে-দৃশ্যের তাঁরা কিসের সঙ্গে তুলনা করবেন!



অলিম্পিকের স্বর্ণ-পদক



উড়ন্ত শিখ মিলখা সিং

অলিম্পিক ও আমরা

পদক জয় নয়, অলিম্পিকে অংশগ্রহণই বড় কথা। মূল কথা হল, অলিম্পিকের মাধ্যমে বিশ্বমৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা। 'অংশ-গ্রহণই' যদি প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তা হলে নানা

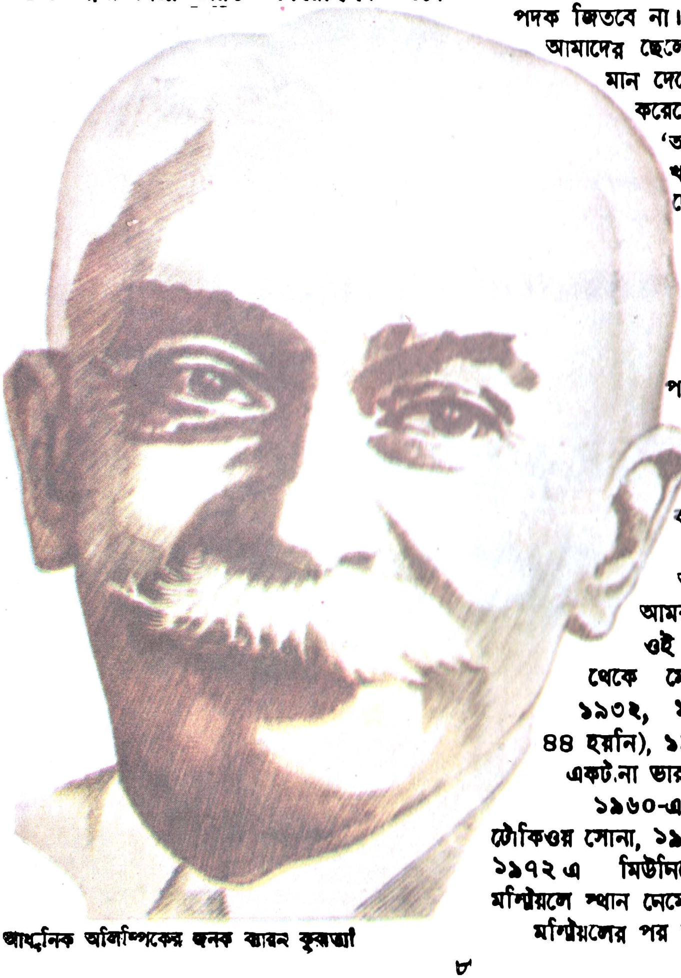
প্রশ্ন উঠবে। আবার অনেক প্রশ্নের সমাধানও পাওয়া যাবে। অংশগ্রহণ বড় কথা হলে দল নির্বাচনে এত কড়াকড়ি কেন? কেন এত কোচিং ক্যাম্প খেলোয়াড়দের জন্য? কেনই বা আমাদের ছেলেমেয়েরা দৌড়ে সর্বশেষ স্থান পেলে, হকিতে সোনা না জিতলে আমরা ভীষণভাবে সমালোচনা করি! কেন পার্লামেন্টে ঝড় ওঠে? তদন্ত কমিটি বসে?

আধুনিক অলিম্পিক শুরু হয় ১৮৯৬ সালে, এথেন্সে। জানি না তখন পরাধীন ভারতে অলিম্পিক-ধারণা কেমন ছিল। অলিম্পিক সম্পর্কে ভারত সচেতন হয় সম্ভবত ১৯২৮-এ। সেই প্রথম অলিম্পিকে অংশ নিয়ে সোনা জেতে। আমস্টার্ডাম থেকে হকি-সোনা নিয়ে ভারত ফিরেছিল। তবে সরকারিভাবে ভারত অলিম্পিকে যোগ দেয় ওই ঘটনার আট বছর আগে, ১৯২০-তে এন্টোয়ার্প-এ।

একটা কথা বলে রাখি, অলিম্পিকে অ্যাথলেটিকস বাদ দিয়ে অন্য কোনো খেলার দল পাঠানো যায় না। একজনও অ্যাথলীট দলে না থাকলে হকি, ফুটবল, সাঁতার প্রভৃতির দল গ্রাহ্য হয় না।

১৯২০-র এন্টোয়ার্প থেকে ১৯৭৬-র মন্ট্রিয়ল—এই ৫৬ বছরের মধ্যে আমাদের খেলোয়াড়দের ব্যর্থতাই বেশি। আগামী জুলাইয়ে মস্কো নিয়ে আমাদের অলিম্পিকে অংশগ্রহণের বয়স হবে ৬০ বছর। মস্কোয় ভারত কী করবে জানি না। তবে 'উড়ন্ত শিখ' মিলখা সিং বলেছেন – 'মস্কোয় ভারত একটিও পদক জিতবে না।' অতীতের নজির এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন খেলার মান দেখেই মিলখা ওই উক্তিটি করেছেন।

'অংশগ্রহণই বড় কথা' মিলখার ওই উক্তির কোনো দাম নেই। গত ৫৬ বছরের কথা টেনে এনে, কী পাইনি তার হিসাব মেলানোও নিরর্থক। তবুও জানিয়ে রাখি, হকির বাইরে অলিম্পিক থেকে পদক এসেছে মাত্র একটি—কুস্তিতে। কে ডি যাদব ১৯৫২ সালে হেলসিংকি অলিম্পিকে ফ্রী-স্টাইলের ব্যান্টমওয়েটে একটি ব্রোঞ্জ এনেছিলেন। হকি নিয়ে আর গর্ব করতে পারি না আমরা। তবে দিন তো ছিল ওই হকিতেই। আমস্টার্ডাম থেকে মেলবোর্ন পর্যন্ত ১৯২৮, ১৯৩২, ১৯৩৬ (১৯৪০ ও ১৯৪৪ হয়নি), ১৯৪৮, ১৯৫২ ও ১৯৫৬ একটানা ভারত হকি-সোনা জিতেছে। ১৯৬০-এ রোমে রুপো, ১৯৬৪-এ টোকিওয় সোনা, ১৯৬৮-তে মেক্সিকোয় ও ১৯৭২ এ মিউনিখে ব্রোঞ্জ। ১৯৭৬-এ মন্ট্রিয়লে স্থান নেমে আসে সপ্তমে।


আধুনিক অলিম্পিকের জনক ব্যারন কুবার্তা

মন্ট্রিয়লের পর আমাদের হকিদল বিভিন্ন

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয়েছে বারবার। শেষ পর্যন্ত সব দেশ যদি এবার মস্কো অলিম্পিকে অংশ নেয়, ভারতের পদকপ্রাপ্তি নিয়ে আশঙ্কা থেকেই যাবে। আর, সেজন্য দায়ী হবেন আমাদের কর্মকর্তারাই। তাঁদের অদূরদর্শিতাই হকিকে পদকজয় থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেবে। ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহেও আমরা জানতে পারিনি কোন ভারতীয় দল মস্কো যাবে। মজার ব্যাপার—গত ডিসেম্বরে মস্কো থাকাকালে কিন্তু ওখানে আমি ভারতীয় দলের নাম দেখে এসেছি। অবাক হয়েছিলাম সেই তালিকায় ধ্যানচাঁদের পুত্র অশোককুমারের নাম দেখে। সকলেই জানেন, অনেক আগেই অশোককুমার অবসর নিয়েছেন। হকি-কর্তারা ওই তালিকা পাঠিয়েছিলেন কেন—কে জানে!

অবশ্য এ-কথাও ঠিক—আমরা আমাদের পুরানো পদ্ধতি থেকে সরে গিয়ে হারছি আর হারছি। আর প্রতিবেশী পাকিস্তান আগের পদ্ধতি বজায় রেখে শুধু জিতছে আর জিতছে।

কুস্তি আর হকিতে পদক পেলেও অলিম্পিকে ভারতের আরও কিছু ভাল ফল আছে। অলিম্পিক রেকর্ড-বই খুললে দেখা যাবে ১৯০০-র অলিম্পিকে ২০০ মিটার দৌড়ে যে নরমান প্রিচার্ড রুপো জিতেছিলেন তাঁর নামের পাশে 'ইন্ডিয়া' লেখা রয়েছে। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র নরম্যান ভারতের নাগরিকরূপেই অলিম্পিকে অংশ নেন। সেবার অবশ্য ভারতীয় দল নামে কিছুই যায়নি। অলিম্পিকের রেকর্ড বইয়ে পদকের তালিকায় না থাকলেও আরও কয়েকজন ভারতীয়র নাম রয়ে গেছে। ১৯৬০-এ অলিম্পিকে মিলখা সিং ৪০০ মিটার দৌড়ে ৪৫·৬ সেকেন্ডে চতুর্থ হলেও আগের বারের অলিম্পিক রেকর্ড (৪৬·৭ সেঃ) ভেঙেছিলেন। ১৯৬৪-তে টোকিওয় গুরবচন সিং ১১০ মিটার হার্ডলসে পঞ্চম হন। ১৯৭৬-এ মন্ট্রিয়লে শ্রীরাম সিং ও শিবনাথ সিং পদক না পেলেও কম কৃতিত্ব দেখাননি।

তবুও এ-সব খুশির কথা নয়। এত বড় দেশ, এত জনসংখ্যা। 'অংশগ্রহণই বড় কথা'য় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেড়শো জনের দলও পাঠিয়েছে ভারত। কিন্তু পদক আসেনি। আমরা অলিম্পিকের মন্ত্র 'তুরীয়ান' (সিটিয়াস), 'তুঙ্গীয়ান' (অ ল টি য়া স) 'তেজীয়ান' (ফর্টিয়াস)—অর্থাৎ আরও জোরে দৌড়তে হবে, আরও উপরে উঠতে হবে, আরও শক্তির পরিচয় দিতে হবে—এসবে উদ্বুদ্ধ হইনি। আমাদের জীবনের সঙ্গে খেলা এক হয়নি। খেলাধুলা করি বোধহয় খেলাচ্ছলে।

আর যে-দেশ অলিম্পিকে পদক-তালিকায় এখন শীর্ষে, বিশ্বরেকর্ডের খতিয়ানে সবার উপরে—সেই রাশিয়ায় প্রতিটি স্কুলে পড়ার সঙ্গে খেলাধুলাও আবশ্যিক। যারা স্কুলে ভাল খেলে, তারা প্রতিদিন পড়ার স্কুলের পরে যায় খেলার স্কুলে। খেলার জন্য ওদেশে হাজার-হাজার পৃথক স্কুল—সাঁতারের, জিমন্যাস্টিকসের, অ্যাথলেটিকসের, টেবল টেনিসের, ভারোত্তোলনের, দাবার, ব্যাডমিণ্টনের ফুটবলের। ওদেশে লেখাপড়া বাদ দিয়ে খেলাধুলা যেমন নয়, তেমনি খেলাধুলা না করে শুধু লেখাপড়াও নয়। দেশজুড়ে খেলাধুলার যে ব্যবস্থা রয়েছে তা তুরীয়ান, তুঙ্গীয়ান ও তেজীয়ান হওয়ার আদর্শ সামনে রেখেই। জানি না ওই লক্ষ্যে পৌঁছতে ভারতের কতদিন লাগবে!



দর্শকরা ইচ্ছে করলেই পুতুল-মিশা কিনতে পারেন



নীল গোলাপের গল্প

শৈলেন ঘোষ

ভারী শান্ত এই জায়গাটা। ভারী নির্জন। ওই যে একটা মস্ত প্রাসাদের ভাঙা স্তূপের ফাঁকে ফাঁকে ঝোপ-ঝাড়গুলো চারিদিকে এলোমেলো ডাল-পালা ছড়িয়ে রেখেছে, ওখানে একা-একাই ঘুরে বেড়ায় বালু। ওই ভাঙা পাথরের গায়ে গায়ে পা ফেলে গান গায়। নয়তো, পাথরের তৈরি ওই মানুষের মূর্তিটাকে জড়িয়ে ধরে হাসে, চিৎকার করে। হ্যাঁ, তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে, অনেক, অ-নে-ক দিন আগে হয়ত এখানে কোন রাজার প্রাসাদ ছিল। হয়ত রাজার রাজত্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাসাদের সিংদুয়ারও ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়েছে মাটির ওপর। এখানে কেউ আসে না। এই ভাঙা প্রাসাদের ঝোপ-জঙ্গলে কে আর সাধ করে আসতে চায়! তাই বালু এখানে একা। ভাল লাগে ওর এখানে একা থাকতে আর ওই পাথরের মূর্তিটার দিকে চেয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়তে।

এইখানেই বালু ঘুমোয়। ওই মূর্তিটার পায়ের গোড়ায় ওই যে ফাটা চত্বরটা চকচক করছে, ওইটার ওপর। কেননা, ওর তো আর ঘুমুবার জায়গা নেই! নিথর রাতে এই নির্জনে যখন ফাটা পাঁচিলের গর্তের ফাঁকে একটি টিকটিকি ডেকে ওঠে টক-টক করে কিংবা খুব দূরে, অন্ধকারে গাছের ডালে হুতুম-পেঁচা ক্যারকেরিয়ে হেঁকে ওঠে, সে-হাঁক শুনে বালু চমকে ওঠে না। এই শব্দ, এই ডাক, এই নিঝঝুম অন্ধকার, কিংবা এই খোলা আকাশের হাতছানি—ওরা সবাই ওর বন্ধু। আর বন্ধু এই মানুষের মূর্তিটা। যদিও মূর্তিটার চোখ দুটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রায় মুছে গেছে, একটি হাত ভেঙে পড়েছে মাটিতে, পায়ের আঙুলগুলি ক্ষতবিক্ষত, তবু দেখলে তোমার চিনতে কষ্ট হবে না, এটি একটি বুড়ো-মানুষের মূর্তি। মানুষটি যেন বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, হয়ত অনেক বয়েস। তুমি যদি মূর্তিটি দেখতে দেখতে ভাব, ওর বয়স একশো, তবে বালুকে দেখলে তোমার ঠিক মনে হবে, বালুর বয়স দশ।

এটা একটা ছোট্ট পাহাড়তলি। এক্কাগাড়ি টাট্টু ঘোড়া, বাজার-হাট, দোকান-পাট সব আছে। ক'পা হাঁটলেই মস্ত উঁচু পাহাড়। দূরে ছোট্ট রেল-ইসটিশন। পাহাড়ের গায়ে রেললাইন। মাঝখানে ঝরনা। ঝরনার জল জমে জমে কেমন ছোট্ট একটি ঝিল! ঠিক ছবির মতো। শীত যখন পড়ি-পড়ি করে, তখন নানান দেশ থেকে কত লোক বেড়াতে আসে এখানে! যেদিকে চাইবে, দেখবে, সবার গায়ে ঝকমকে রঙিন পোষাক! চারিদিকে ঝলমল করছে। কেউ হাসছে, কেউ-বা গান গাইছে। নয় তো ছুটতে ছুটতে নাচছে আর খাচ্ছে। চারিদিকে খুশি আর খুশি!

লজ্জা করে বালুর। ওদের সামনে যেতে লজ্জা করে। করবেই তো। বালুর যা চেহারা, জামা কাপড়ের যা ছিরি! তবু বালুকে



যেতেই হয়। যেতে হয় এই ফুলের ডালিটা হাতে নিয়ে। আর পাহাড়তলির এই উঁচু-নিচু পথ হাঁটতে হাঁটতে ওকে হাঁকতে হয়, "ফুল নেবে ফুল, রঙিন ফুল!"

হ্যাঁ, বালু ফুল বিক্রি করে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে যে-ফুলগুলি রোজ সকালে ফুটে থাকে, সেগুলি তুলে আনে বালু। তারপর ডালি ভরে সেগুলি সাজিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। কত রকম ফুল যে সে তুলে আনে! কত রঙ! দেখলে তোমারও চোখ জুড়িয়ে যাবে। তবু একটি ফুল সে তার ডালিতে কোনদিন তুলে আনেনি। তুলে আনেনি সেই নীল পাপড়ির গোলাপটি! কেননা, বালু জানে, সেই নীল গোলাপটি তার মা। বালু জানে, ঠিক জানে, ওই যেখানে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের চূড়াটা উঁকি মারছে, সেইখানে ওই উঁচুতে নীল গোলাপটি ফুটে আছে।

এক-একদিন ফুল বেচতে বেচতে, সাঁকো পেরিয়ে ওই পারে চলে যায় বালু। পাহাড়ের গায়ে গায়ে যেখানে পাইন গাছের ছায়ারা গড়িয়ে পড়েছে, সেখানটা বেশ লাগে তার! একটু দূরে ঝিলের ধারে কত লোক আজ বন-ভোজন করতে এসেছে! কী খুশি দ্যাখো! কেমন গাছের ডালে দোলনা ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে আর গান গাইছে! ওদের খুশির সুর দূর থেকে দুলতে দুলতে ভেসে আসছে। সেই খুশি বালুর কানে কানে যতই ছড়িয়ে যায়, ততই যেন আনন্দে শিউরে ওঠে সে। আপন মনে বালুও গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠে। গাইতে গাইতে সবুজ ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ে। তারপর ডালি-ভর্তি ফুলগুলি ঘাসের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে গলায় তার যত গান ছিল সব যেন উজাড় করে দেয়!

হঠাৎ কে যেন খুব কাছে হেসে উঠল, "হি-হি-হি।" যেন একটি ছোট্ট মেয়ের গলা। গান থামিয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল বালু। হ্যাঁ, তাকিয়ে দেখে, যা ভেবেছে ঠিক তাই, ছোট্ট একটি মেয়ে। বালুর চেয়েও ছোট্ট। বেগনি রঙের ফ্রক পরেছে। ফ্রকের গায়ে লাল ফুটকির ফুল আঁকা। মাথায় রিবন। এক গোছা চুল কপালে লুটিয়ে আছে। অদ্ভুত নীল তার চোখ দুটি। কী ভালই লাগছে!

"হি-হি-হি!" বালুর দিকে চেয়ে আবার হাসল সে। তার চোখের পাতা দুটি হাসতে হাসতে কেঁপে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল, "থামলে কেন?"

কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে বালু।

মেয়েটি তেমনি হাসতে হাসতেই বললে, "কী মিষ্টি গান গাও তুমি।"

কেমন যেন লজ্জায় লাল হয়ে গেল বালুর মুখখানা!

সে আবার বললে, "গাও না আবার!"

বালু চুপ করে রইল।

সে জিজ্ঞেস করলে, "গাইবে না? তবে এসো না খেলি। তুমি দোলনায় চাপতে পারো?"

এবার যেন হ্যাঁ বলে, বালুর ঘাড়টা আপনা থেকে দুলে উঠল। মেয়েটি অমনি আচমকা বালুর হাতটা ধরে ফেলল। বললে, "তবে এসো আমার সঙ্গে।"

বলতে বলতে সে বালুর হাত ধরে ছুট দিলে। বালু কিছু বলতে পারল না। সেও ছুটল আর আনন্দে শিউরে উঠল। কেননা, এমন করে আপন ভেবে কেউ তো আর কোনদিন হাত ধরেনি। কেউ তো তাকে এমন-করে খেলতে ডাকেনি! মেয়েটি ছুটতে ছুটতে যতই ডাকছে আর হাসছে, বালুর যেন ততই মনে হচ্ছে, ওই ঝরনার ঝিরিঝিরি নতুন সুরে নূপুর বাজাচ্ছে। মেয়েটির মাথার রাশি রাশি

চুল হাওয়ায় যতই নেচে উঠেছে, বালুর মনের খুশি ততই যেন উপচে উঠে ওই ঝরনার জলের মতো লাফিয়ে পড়ছে। এই প্রথম, আজই প্রথম ওর হাতটি ধরে ডাক দিয়েছে ওর খেলার সাথী। আজই প্রথম ওর ছোট্ট বুকখানি দোলনায় দুলে দুলে ঢেউ খেলছে! দোলনায় দোলা দিয়ে বালুকে জিজ্ঞেস করলে সে, ''কেমন লাগছে তোমার ?''

বালু বললে, ''খুউব ভাল!''

সেই মেয়েটি এবার সেই দোলনা ঠেলতে ঠেলতে, একটু কাছে একটু দূরে ছুটতে ছুটতে জিজ্ঞেস করলে, ''তোমার নাম কী?''

বালু এবার দুলতে-দুলতে একটু কাছে, একটু দূরে উড়তে উড়তে বললে, ''বালু। তোমার?''

''তিতু।'' মেয়েটি উত্তর দিলে।

তারপর তিতু বললে, ''বালু, যে-গানটা গাইছিলে, সেইটা এবার গাও।''

বালু বললে, ''ধ্যাত! আমি গাইতে পারি না।''

সে বলল, ''কে বললে পার না। হ্যাঁ পার, খুব ভাল পার।''

বালু গান গাইল। সেই ছোট্ট পাহাড়-তলির সেই সবুজ মাঠ তার গানের সুরে ভরে গেল। সেই গান তিতুর কানে বাজতে বাজতে খুশিতে উছলে উঠল। সুন্দর সেই ঝিলের জলে ঝিলিমিলি পাখনা মেলে রুপোর মতো মাছের দল সাঁতরে উঠল। আর ছোট্ট রেল ইসটিশনের ছোট্ট গাড়ি ঠিক তখুনি কু-কু করে হেঁকে উঠল। তিতু তখন দোলনা ছেড়ে ছুট দিল পাহাড়ের ওই ওপারে।

বালু তখন দোলনা থেকে লাফিয়ে নেমে, ছুটতে ছুটতে হাঁক দিল, ''তিতু, যেও না। ওদিকে বন।''

তিতু ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের বনে লুকিয়ে পড়ল। লুকিয়ে লুকিয়ে ডাক দিল, ''বালু বলে টুকি-ই-ই!''

বালু বনের ভেতর ঢুকে পড়ল। এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেল, পাইন বনের আড়ালে লুকিয়ে আছে তিতু। পিছন থেকে চুপি চুপি গিয়ে তিতুর চোখ দুটি চেপে ধরল। তিতু হেসে উঠে ডাক দিল, ''বালু-উ-উ!''

বালুও খিল-খিল করে হাসতে হাসতে বললে, "কেমন ঠকিয়েছি!"

তারপর দুজনেই হেসে উঠল। দুজনেই আপন হয়ে সেই পাইনের ছায়ায় ছায়ায় লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিল। খেলতে খেলতে তিতু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "বালু, কে আছে তোমার ?"

"আমার ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ ।"

"তাকে দেখবে তুমি ?"

"হ্যাঁ।"

"তবে এসো !" তিতুর হাত ধরে বালু এবার ছুট দিল। ছুটে এল সেই ভাঙা স্তূপের জঞ্জালে।

"এ কী ! এ যে জঞ্জাল !" অবাক হল তিতু।

"এইখানেই তো আমি থাকি।"

"এখানে ?"

"হ্যাঁ, এদিকে এসো।" বলে বালু সেই পাথরের মূর্তির সামনে এসে দাঁড়াল।

"এ যে পাথর !" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে তিতু।

"এই তো আমার আপনজন, আমার বন্ধু।" বলে আনন্দে আত্মহারা বালু তিতুর হাত ধরে সেই পাথরের মূর্তি ছুঁয়ে লাফিয়ে উঠল। বললে, "দ্যাখো, দ্যাখো তিতু এসেছে। আমার বন্ধু। দ্যাখো, এই তো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে।" তারপর তিতুর হাত ধরে নেচে উঠল বালু। যেন চিরদিনের জন্য ও এক বন্ধু খুঁজে পেয়েছে। এ-বন্ধু বুঝি-বা ওকে আর কোনওদিন ছেড়ে যাবে না। কোনদিনও না।

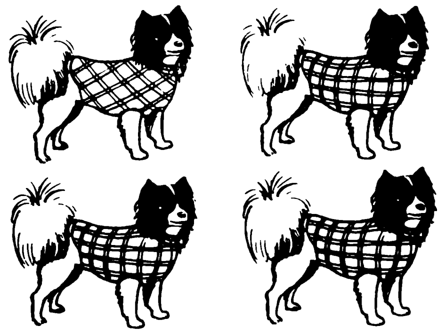
বালুর মতো খুশি হয়ে তিতুও জিজ্ঞেস করল, "তোমার মা-ও বুঝি এখানে থাকেন ?"

"না।" বালু থামল। "আমার মা এখানে থাকেন না। মা আমার ওই দ্যাখো দূরে, ওই যে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়-চূড়াটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে আমার মা আছেন !"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি বিমল দাস

ছবির মজা

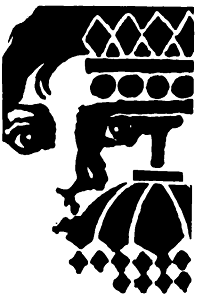


চারটে ছবি কি একইরকম ? না, একটা একটু আলাদা। কোন্‌টা আলাদা, বলতে পারো ?

(প্রথম কুকুরের গায়ের জামার নকশাটা একটু অন্যরকম।)



ইনি একজন জাদুকর। জাদুর মন্ত্র পড়ছেন। রঙ-পেনসিল বুলিয়ে এঁকে রঙিন করো।



কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে : জয়রামবাবুর ছেলে জ্যোতি নিরুদ্দেশ। চন্দ্রভানু চুরি করেছেন তাকে। জ্যোতিকে নিয়ে ট্রেন যাত্রায় দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিসের হাতে আটক বেহুঁশ একটি ছেলেকে জ্যোতি ভেবে গ্রহণ করেন জয়রামবাবু। স্মৃতিভ্রষ্ট আসল-জ্যোতি চান্দোলির দোকানি চৌবেজির ঘরে ঠাঁই পায়। ইতিমধ্যে আসল-জ্যোতি ভেবে নকল-জ্যোতিকেও চন্দ্রভানু চুরি করেন। চান্দোলির সূর্যনারায়ণ জয়রামের বন্ধু। চৌবেজির ঘরে ঠাঁই পাওয়া ছেলেটি যে তাঁরই বন্ধুপুত্র, সূর্যনারায়ণ তা জানেন না। ছেলেটির তিনি নাম রেখেছেন দেবদত্ত। জয়রাম ইতিমধ্যে চিঠি লিখে সূর্যনারায়ণকে জানিয়েছেন যে, তিনি চান্দোলিতে আসছেন। তারপর...

॥ ১৬ ॥

চিঠিটা পেয়ে সূর্যনারায়ণবাবু বড় খুশি হলেন। এতদিন পরে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে এটা ভেবেই তাঁর বড় আনন্দ হল।

তিনি চিঠিখানা হাতে নিয়ে ভেতর-বাড়িতে গেলেন। ডাকলেন, "কই, কই গো তুমি? কোথায় গেলে?"

সূর্যনারায়ণবাবুর স্ত্রী সারা-জীবন পুজো আর জপ-তপ নিয়েই থাকেন। আর মাঝে-মাঝে সংসারের তদারকি করেন। বাড়িতে লোক বলতে তো কেউ নেই। একটা মেয়ে ছিল। তার বিয়েও হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পর বেশি দিন বাঁচেনি। বিয়ের কিছুদিন পরেই সে মারা যায়। তারপরে আর কোনও সন্তান হয়নি তাঁর। তখন থেকেই তিনি ঈশ্বরের পায়ে নিজেকে নিবেদন করে দিয়ে শান্তি খুঁজতে চেয়েছেন। আর বড়বাবু তাঁর নিজের সম্পত্তি আর গঙ্গায় স্নান নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকছেন।

তার পরে এল কোথাকার এক নাম-না-জানা ছেলে। পরের ছেলে সে। কে তার বাবা, কে তার মা, কোথায় তার বাড়ি কিছুই তিনি জানতে পারেননি। কিন্তু তাকে নিয়েই তিনি জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। এই সময়ে বহুদিনের পুরনো বন্ধুর আসার খবর পেয়ে খুব আনন্দ পেলেন। হঠাৎ ভেতর-বাড়িতে যাবার পথে রঘুয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন "হ্যাঁ রে, তোর মা কোথায়?"

রঘুয়া বললে, "মা তো পুজোর ঘরে ঢুকেছেন।"

চিঠিটা তখনও তাঁর হাতে রয়েছে। চিঠিটা তিনি স্ত্রীকে পড়ে শোনাতেই গিয়েছিলেন। কিন্তু না, তিনি যখন পুজোর ঘরে ঢুকেছেন তখন আর এক ঘণ্টার আগে সেখান থেকে বেরোবেন না।

তিনি আবার তাঁর নিজের বসবার ঘরে চলে এলেন। একটু চেয়ারে বসে জয়রামবাবুর চিঠিটা পড়লেন। তারপর ভাবতে লাগলেন কোন ঘরে তাকে থাকতে দেবেন। একমাত্র ছেলেকে হারানো যে কী কষ্টের তা তিনি নিজের মেয়েকে হারিয়েই বুঝতে পেরেছেন।

হঠাৎ ভাববার মাঝে ছেদ পড়ল। মনে হল কে যেন সিঁড়ি দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে তাঁর ঘরের দিকে আসছে। বললেন, "কে?"

"আমি বড়বাবু, আমি দেবু।" বলতে বলতে দেবদত্ত ঘরে ঢুকল।

তিনি বললেন, "কী হয়েছে তোর? এত হাঁফাচ্ছিস কেন? কোথায় ছিলি? কোথা থেকে দৌড়তে দৌড়তে আসছিস?"

দেবু বললে, "তুমি সাধুকে ঠকালে?"

"কোন সাধুকে?"

"সেই যে বহুদিন আগে আমি একজন সাধুকে তোমার কাছে এনেছিলুম। বলেছিলুম তাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে।"

বড়বাবু বললেন, "তা আমি তো তাঁকে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলুম।"

দেবু বললে, "আমার সামনে তুমি টাকা দিয়েছিলে, কিন্তু সে টাকা কি শেষ পর্যন্ত সে পেয়েছিল?"

"পায়নি মানে? তোর সামনেই তো তার হাতে টাকা দিয়েছিলুম।"

দেবু বললে, "না তুমি দাওনি। তুমি মিথ্যে কথা বলছ।"

"আমি মিথ্যে কথা বলছি? তুই বলছিস কী?"

"হ্যাঁ, তুমি মিথ্যে কথাই বলছ। সেই সাধুবাবা কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারে না।"

বড়বাবু দেবুর ব্যবহার দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এমন ব্যবহার তো দেবু কখনও করে না তাঁর সঙ্গে।

তিনি বললেন, "তোর সাধু মিথ্যে কথা বলতে পারে না, আর আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি? এতদিন আমার কাছে থেকে এই বিশ্বাসই তোর হল?"

দেবু বলল, "হ্যাঁ, আগে আমার সে-বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু আজকে আমার সেই বিশ্বাস হল।"

বড়বাবু বললেন, "কিন্তু তুই ছাড়া আমার আর কে আছে, তুই বল? আমি আর কতদিন বা বাঁচব। আমি মরে গেলে তুই-ই তো এই সব সম্পত্তি টাকা-কড়ি যা কিছু আমার আছে, সবই তুই পাবি। আমি তো আর ও-সব সঙ্গে করে নিয়ে যাব না। যাতে তোর কোনও কষ্ট না হয় সেই জন্যেই তো টাকা-কড়ি-সম্পত্তি সব জমাচ্ছি।"

"কিন্তু তা বলে তুমি অন্য লোককে ঠকাবে?"

বড়বাবু বললেন, "কখন ঠকালুম আমি? কাকে ঠকালুম?"

"কেন, সেই সাধুবাবাকে! তুমি ওর কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা কেড়ে নাওনি? বলো, সত্যিই কেড়ে নাওনি?"

বড়বাবু খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "হ্যাঁ কেড়ে নিয়েছিলুম। কিন্তু কেন কেড়ে নিয়েছিলুম তা তো জিজ্ঞেস করলি না? আমি তো তোর ভালর জন্যই কেড়ে নিয়েছিলুম। আমি মরে গেলে যাতে তোর কষ্ট না হয়, যাতে টাকার অভাবে তোকে পথে ভিক্ষে না করতে হয়, সেই জন্যেই তো সাধুকে দেওয়া টাকাগুলো কেড়ে নিয়েছিলুম। তোর ভালর জন্যেই তা করেছি। নইলে আমার কী স্বার্থ।"

দেবু বললে, "পঞ্চাশটা টাকা দিলে তোমার কি খুব লোকসান হত? তোমার তো অনেক টাকা। তুমি তো অনেক টাকা পরকে ঠকিয়ে উপায় করেছ!"

"আমি পরকে ঠকিয়েছি? তুই বলছিস কী?"

"না তো কী? তোমার এই এত সম্পত্তি কি সহজে হাতে এসেছে? তুমি অন্য

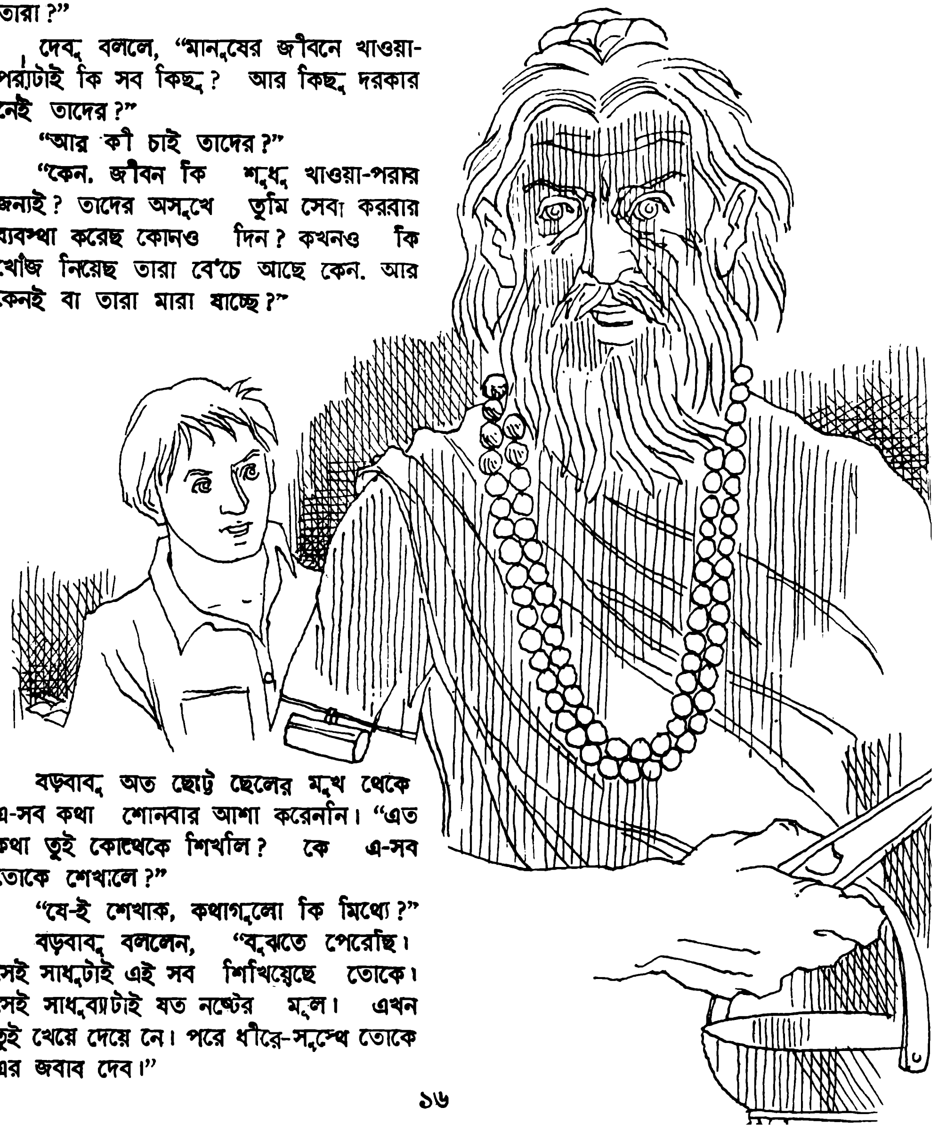
লোককে ঠকিয়ে তাদের কম মজুরি দিয়ে তোমার এত সম্পত্তি হয়েছে। আমি কি তা জানি না ভেবেছ? তুমি নিজে কিছু খেটে উপায় করেছ? সব কিছু তো পরকে ঠকিয়ে হয়েছে। তার বদলে তুমি তাদের কী দিয়েছ? শুধু খাওয়া আর পরা ছাড়া আর কিছু দিয়েছ? তারা আর কী পেয়েছে তোমার কাছে?"

বড়বাবু বললেন, "তারা আর কি চায় আমার কাছে? খাওয়া-পরা ছাড়া আর কি চায় তারা?"

দেবু বললে, "মানুষের জীবনে খাওয়া-পরাটাই কি সব কিছু? আর কিছু দরকার নেই তাদের?"

"আর কী চাই তাদের?"

"কেন, জীবন কি শুধু খাওয়া-পরার জন্যই? তাদের অসুখে তুমি সেবা করবার ব্যবস্থা করেছ কোনও দিন? কখনও কি খোঁজ নিয়েছ তারা বেঁচে আছে কেন, আর কেনই বা তারা মারা যাচ্ছে?"



বড়বাবু অত ছোট্ট ছেলের মুখ থেকে এ-সব কথা শোনবার আশা করেননি। "এত কথা তুই কোত্থেকে শিখলি? কে এ-সব তোকে শেখালে?"

"যে-ই শেখাক, কথাগুলো কি মিথ্যে?"

বড়বাবু বললেন, "বুঝতে পেরেছি। সেই সাধুটাই এই সব শিখিয়েছে তোকে। সেই সাধুব্যাটাই যত নষ্টের মূল। এখন তুই খেয়ে দেয়ে নে। পরে ধীরে-সুস্থে তোকে এর জবাব দেব।"

দেবু চলে গেল। তিনি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন। এতটুকু এক ফোঁটা ছেলের মাথায় এ-সব জ্ঞান কোথা থেকে এল।

কিন্তু, এ নিয়ে তিনি আর ভাবতে পারলেন না। তিনি তখন জয়রামবাবুর আসবার জন্যে ব্যস্ত।

বহুদিন বাদে জয়রাম আসছে। তার থাকার শোবার বন্দোবস্ত করতে হবে। পাশের ঘরে রঘুয়া কাজ করছিল। তাকে ডেকে বললেন, "ঘরটা ভাল করে পরিষ্কার করে

দে। আমার এক বন্ধু কলকাতা থেকে আসছে। সে এখানে আমার কাছে থাকবে। এ-বাড়িতেই থাকবে খাবে। এ-বাড়িতেই কিছুদিন থাকবে। একটা নতুন চাদর পেতে দে বিছানায়।”

ঘন্টাখানেক বাদে স্ত্রীও পুজোর ঘর থেকে বেরোলেন। তাকে গিয়ে বললেন খবরটা। বললেন, “আমার বন্ধু জয়রাম আসছে, জানো? এখানে কিছুদিন থাকবে, খাবে। তোমাকে বলে রাখছি। যেন কোনো অযত্ন না হয়।”

স্ত্রী বললেন, “কেন আসছেন তিনি?”

“আমিই আসতে বলেছিলাম। তার একমাত্র ছেলেকে কে আবার চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। মনটা তার খুব খারাপ হয়ে গেছে। অনেক তীর্থ ঘুরে ফেরবার সময় আমার এখানে কিছুদিন থাকবে লিখেছে। আমার অনেক কাল আগেকার বন্ধু। আমি কলকাতায় গেলে ওর বাড়িতেই উঠি।”

সব ব্যবস্থা শেষ হয়ে গেল। দুপুরবেলাই এসে গেল জয়রাম। স্টেশন থেকেই সূর্যনারায়ণবাবু তাকে বাড়িতে নিয়ে এলেন।

অনেক দিন পরে আবার দুই বন্ধুতে দেখা। খুবই খুশি হল জয়রাম। বাড়িতে এসে বললে, “তোমার বাড়িটা বেশ ভাল। আমি ভাই কিছুদিন তোমার এখানে থাকব। আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে।”

“পুলিস কী বলছে?”

জয়রাম বললে, “পুলিস আর কত করবে। প্রথমবার তো পুলিসই খুঁজে বার করে দিয়েছিল। অনেক কষ্টে আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আমার কপালে পুত্র-সুখ না থাকলে পুলিস কী করবে? পুলিসের আর দোষ কী?”

সূর্যনারায়ণবাবু বললেন, “তুমি তো জানো আমার এক মেয়ে ছিল। মেয়ের বিয়েও দিয়েছিলুম। কিন্তু সেই মেয়ে মারা যাবার পর থেকে তোমারও যা অবস্থা আমারও তাই। তবে সম্প্রতি একটা ছেলে পেয়েছি ভাই।”

“ছেলে পেয়েছ, মানে?”

“ছেলে পেয়েছি মানে, সে এক বিচিত্র ঘটনা ভাই। তোমাকে তো বলেছিলুম আমাদের এখানে দেবরাজ চৌবে নামে এক

মুদিখানার মালিক আছে। সে একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখে যে তার দোকানের সামনে একটা অচেনা-অজানা ছেলে শুয়ে আছে। সে তাকে নিজের বাড়িতেই রেখে দিলে। তারপর দেখলুম ছেলেটা খুব বুদ্ধিমান। তা গরিবের ঘরে থাকলে খাওয়া-খরচও লাগে অনেক। তাকে আমি নিয়ে এসে আমার বাড়িতে ছেলের মতো মানুষ করছি। সেই থেকেই সে আমার কাছেই রয়েছে—"

জয়রাম জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় সে ?"

সূর্যনারায়ণ বললেন, "এখানেই আছে।" বলে রঘুয়াকে বললেন, "দেবদত্তকে ডেকে দে তো রঘুয়া—"

রঘুয়া বললে, "আমি ডেকে দিচ্ছি বড়বাবু।"

জয়রাম বললে, "কার ছেলে, কিছু খোঁজ নিয়েছ ?"

"ছেলেটা ভাই কিছুই বলতে পারে না। কোথায় বাড়ি, বাবার নাম কী, কিছুই সে বলতে পারে না। সব ভুলে গেছে। শুধু বলে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছে পুলিসের ভয়ে—"

"পুলিসের ভয়ে ? পুলিসের আবার ভয় কী ?"

"তা জানি না।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কী ? তারপর থেকে তাকে আমার কাছেই রেখেছি। আমারও ছেলে ছিল না। বাড়িটা একেবারে খাঁ-খাঁ করত সারাক্ষণ। সে আসার পর থেকে তবু আমার একটা কাজ হয়েছে।"

জয়রাম বললে, "তাকে একবার ডাকো না আমার কাছে।"

সূর্যনারায়ণ বললেন, "তাকেই তো ডাকতে পাঠালাম।"

"তার নাম কী ?"

সূর্যনারায়ণ বললেন, "তার আসল নাম তো জানি না। আসল নামটা যে তার কী তাও সে বলতে পারে না, তাই তার নাম রেখেছি দেবদত্ত। দেবতার দান তো, তাই তার ওই নাম দিয়েছি—"

চান্দোলির রাস্তায় তখন ঠা-ঠা করছে রোদ। সাধুবাবা একলা হাঁটতে হাঁটতে চলেছিল। সাধুবাবা সারাজীবন এমনি ঘুরে ঘুরেই কাটিয়েছে। এই পৃথিবীটাই যার ঘর, তার আবার নিজের ঘর বলে কী থাকবে ?

হঠাৎ পেছন থেকে ডাক এল, "সাধুবাবা, সাধুবাবা—"

সাধুবাবা পেছন ফিরে দেখলে কে যেন দৌড়তে দৌড়তে তার নাম ধরে ডাকছে আর তার দিকেই দৌড়তে দৌড়তে আসছে।

কাছে আসতেই সাধুবাবা তাকে চিনতে পারলে। সেই ছেলেটা।

দেবদত্ত সাধুবাবার কাছে এসে হাঁফাতে লাগল। হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, "আমি তোমার সঙ্গে যাব সাধুবাবা—"

"কোথায় যাবে ?"

দেবু বললে, "তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানেই যাব।"

"কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে তো তোমার অনেক কষ্ট হবে।"

"কষ্ট হোক। আমি সব কষ্ট সহ্য করতে পারব। তোমার সঙ্গে থাকতে পারলে আমার কোনও কষ্ট হবে না।"

"কিন্তু, তুমি তোমার বাবা-মাকে বলে এসেছ ?"

দেবু বললে, "না, আমি বাবাকে খুব বকে দিয়েছি। কেন আমার সামনে পঞ্চাশটা টাকা তোমার হাতে দিয়ে আবার আমার আড়ালে সে টাকা কেড়ে নিলে। কেন তোমাকে ঠকালে বড়বাবু ? তাই আমি বাবাকে বকে দিয়েছি।"

সাধুবাবা হাসতে লাগল। বললে, "কিন্তু তুই যে আমার সঙ্গে এলে তোর বড়বাবু যদি পুলিসে খবর দেয় ?"

"দিলে দেবে। আমি বলব আমি নিজের ইচ্ছেতেই সাধুবাবার সঙ্গে এসেছি। আর তা ছাড়া বড়বাবু আমার বাবা নয়।"

"বাবা নয় তোর ? তাহলে কে তোর বাবা ?"

দেবু বললে, "বাবাও নয়, কেউই নয়। আমার নিজের বাবা কে তা কি আমি জানি ছাই ? তা যদি জানতুম তো সেখানেই চলে যেতুম। আমার আসল নামটাই যে কী তাই-ই আমি জানি না।"

"তাহলে দেবদত্ত নামটা তোর কে দিলে ?"

দেবু বললে, "ওই বড়বাবু। বড়বাবুই আমার ওই নাম রেখেছিল।" (ক্রমশ)

ছবি অনুপ রায়

কিচ্ছুটি নেই ! কিচ্ছুটি নেই !

শক্তি চট্টোপাধ্যায়



বাঘের মাসি ভালই বাসি, বোনঝি বিষম উৎপেতে
তাও তো ঝাঁকিদরশ আশায় লনচ ভাসিয়ে হয় যেতে
মাতলা আর মৃদঙ্গ ভেঙে, এই-খালি ওই-খালির ধার
ভাসতে ভাসতে জীবন অন্ত, তীর ছুঁতে একদিন কাবার।

বন দেখেছি শাল-সেগুনের, ছবির মতন, চিরোল পথ—
পাথর-নুড়ির ঠুনুক-ঠুনুক, ঝর্না-টিলা ও পর্বত।
কিচ্ছুটি তার নেই এখানে, মধ্যে-মাঝে ক্ষীরের চর,
কান-ঝুলুঝুল কুক্কুরে-বন, স্কন্ধ-সমান পরের পর।

লবডঙ্কা দর্শনীয়, গোলমেলে জল, বকপাখি
উবদো ভুরুর মতন নৌকো আর নালিঘাস, সাংঘাতিক
ঢিবি-কাছিম, উড়ন্ত চ্যাং, এঁটেল মাটির আঠায় কাত—
মাল্লা-মাঝি গান জানে না, কয় না কথা, কী বজ্জাত!

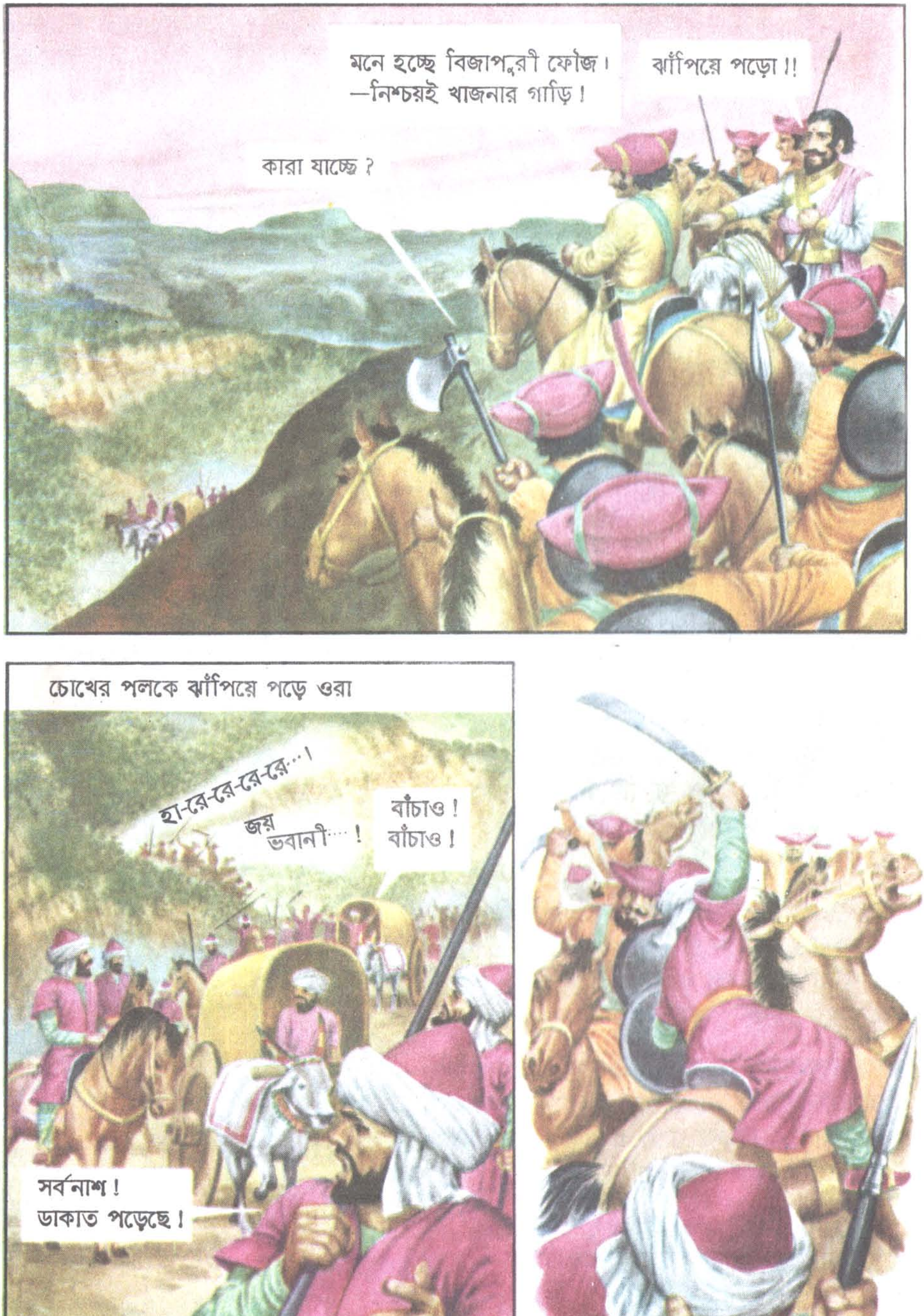
ছবি দেবাশিস দেব

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

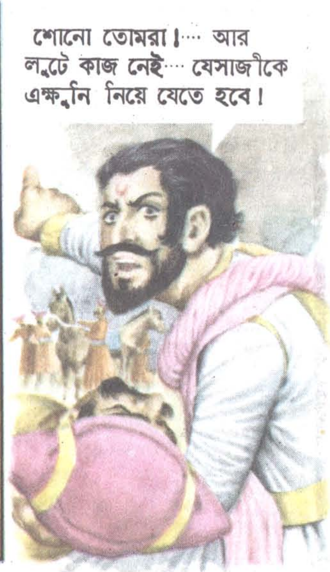
সদাশিব

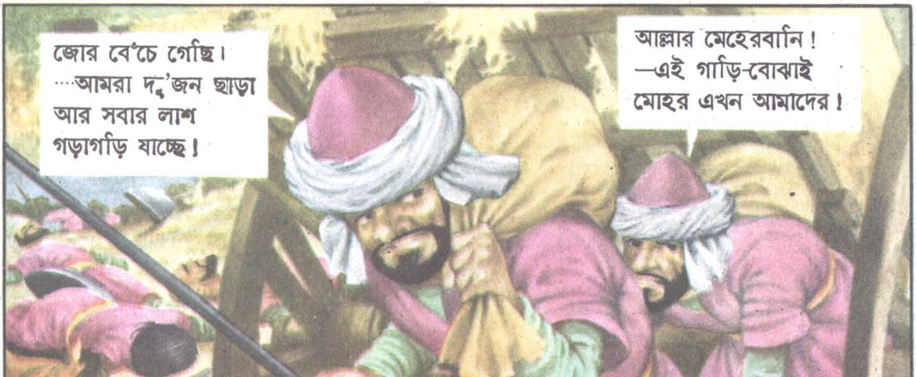
আদিকাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ





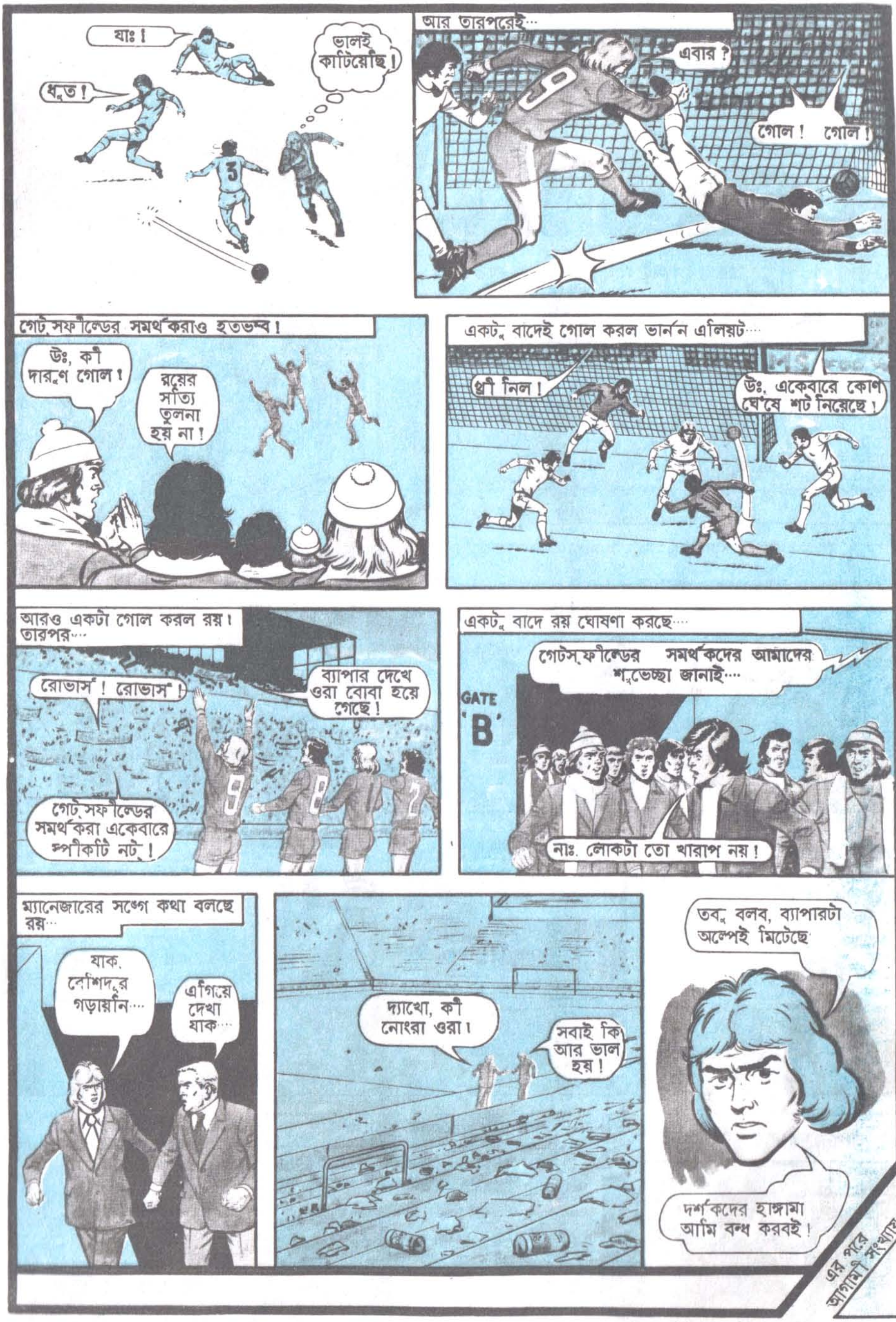




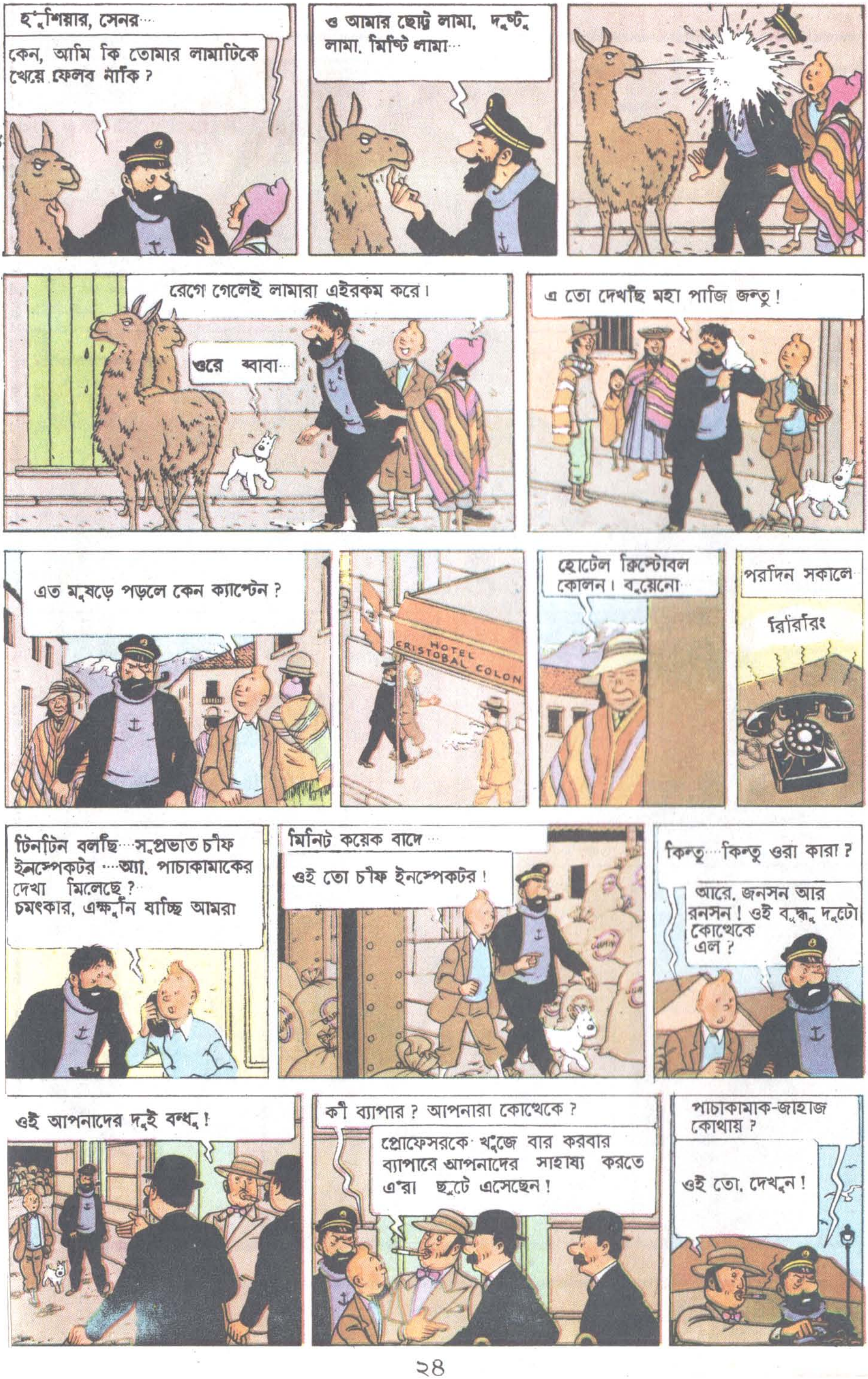


(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


রোভার্সের রয়
গেটস্‌ফীল্ড গুণ্ডাদের সমর্থকরা হাঙ্গামা বাধিয়েছে
পুলিসকে খবর দাও!
পুলিস! পুলিস!
REFRESHMENTS
রয় মাঠে এসে দাঁড়াতে...
ক্যামেরায় গুণ্ডামির ছবি তুলে নিচ্ছি...
তোমার কিচ্ছু দোষ নেই, রয়!
গুণ্ডামির ছবি টিভিতে দেখাব!
এই রে, আমাদের ছবি!
দেখুন, কী ছেলেমানুষি কাণ্ড!
সবাই দেখছে...
অথচ এরাই কিনা নামী দলের সমর্থক!
হাহাহা
পরমুহূর্তে খেলার ছবি...
যা নিয়ে এত কাণ্ড, সেই ঘটনাটা দেখুন...
দেখতেই পাচ্ছেন গোল হয়নি! তাহলে?
শুরু হল খেলা...
গেটসফীল্ডের দর্শকদের মুখে আর কথা নেই!
দারুণভাবে বল ধরেছে রয়...



যাঃ !
ধুত !
ভালই কাটিয়েছি !
আর তারপরেই···
এবার ?
গোল ! গোল !
গেট্‌সফীল্ডের সমর্থকরাও হতভম্ব !
উঃ, কী দারুণ গোল !
রয়ের সত্যি তুলনা হয় না !
একটু বাদেই গোল করল ভার্নন এলিয়ট···
থ্রী নিল !
উঃ, একেবারে কোণ ঘেঁষে শট নিয়েছে !
আরও একটা গোল করল রয়। তারপর···
রোভার্স ! রোভার্স !
ব্যাপার দেখে ওরা বোবা হয়ে গেছে !
গেট্‌সফীল্ডের সমর্থকরা একেবারে স্পীকটি নট্‌ !
একটু বাদে রয় ঘোষণা করছে···
গেটস্‌ফীল্ডের সমর্থকদের আমাদের শুভেচ্ছা জানাই···
GATE 'B'
নাঃ. লোকটা তো খারাপ নয় !
ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছে রয়···
যাক. বেশিদূর গড়ায়নি···
এগিয়ে দেখা যাক···
দ্যাখো, কী নোংরা ওরা।
সবাই কি আর ভাল হয় !
তবু বলব, ব্যাপারটা অল্পেই মিটেছে
দর্শকদের হাঙ্গামা আমি বন্ধ করবই !
এর পরে আগামী সংখ্যায়


হুঁশিয়ার, সেনর…
কেন, আমি কি তোমার লামাটিকে খেয়ে ফেলব নাকি ?
ও আমার ছোট্ট লামা, দুষ্টু লামা, মিষ্টি লামা…
রেগে গেলেই লামারা এইরকম করে।
ওরে ব্বাবা…
এ তো দেখছি মহা পাজি জন্তু !
এত মুষড়ে পড়লে কেন ক্যাপ্টেন ?
HOTEL CRISTOBAL COLON
হোটেল ক্রিস্টোবল কোলন। বুয়েনো…
পরদিন সকালে…
রিঁরিঁরিং
টিনটিন বলছি…সুপ্রভাত চীফ ইনস্পেকটর …আ্যা, পাচাকামাকের দেখা মিলেছে ?…
চমৎকার, এক্ষুনি যাচ্ছি আমরা
মিনিট কয়েক বাদে…
ওই তো চীফ ইনস্পেকটর !
কিন্তু…কিন্তু ওরা কারা ?
আরে, জনসন আর রনসন ! ওই বুদ্ধু দুটো কোত্থেকে এল ?
ওই আপনাদের দুই বন্ধু !
কী ব্যাপার ? আপনারা কোত্থেকে ?
প্রোফেসরকে খুঁজে বার করবার ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করতে এঁরা ছুটে এসেছেন !
পাচাকামাক-জাহাজ কোথায় ?
ওই তো, দেখুন !



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : কাকাবাবু আর সন্তু এবার অভিযানে এসেছে হিমালয় পাহাড়ে, এভারেস্ট চূড়ার দিকে। কিছুদূর এগোবার পর শেরপা ও মালবাহকেরা ইয়েতির মতন একটা বিশাল কোনো জানোয়ার দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়। শুধু মিংমা নামে একজন শেরপা ফিরে আসে। কাকাবাবু ওয়্যারলেসে খবর পাঠালে হেলিকপটারে চেপে দু'জন মিলিটারি অফিসারও আসেন সাহায্য করতে। সেই ছোট দলটি ইয়েতির সন্ধানে এগোলে হঠাৎ এক সময় কাকাবাবু পেছন থেকে অদৃশ্য হয়ে যান।....জ্ঞান হওয়ার পর কাকাবাবু দেখলেন তিনি মাটির নীচে একটা সুড়ঙ্গের মতন জায়গায়। সেখানে রঙের মুখোশপরা কিছু মানুষ রয়েছে এবং অনেক রকম যন্ত্রপাতি। লোকগুলো কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে চলল তাদের নেতার কাছে। তারপর—।

॥ ১৯ ॥

কাকাবাবু প্রথমটায় সত্যিকারের ভয় পেয়ে আঁতকে উঠলেন।

পাথর কেটে বানানো হয়েছে একটা চৌকো-মতন টেবিল। তার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে সন্তু। দেখলেই মনে হয়, সে মরে গেছে।

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দু'জন মুখোশধারী তাঁর হাত চেপে ধরে আছে। কাকাবাবু প্রচন্ড শক্তিতে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারলেন না।

তিনি ধরা গলায় বললেন, "এ কী! সন্তু এখানে এল কী করে? তোমরা সন্তুকে নিয়ে কী করেছ?"

মুখোশধারীরা কোনো উত্তর দিল না। ডান পাশ থেকে অন্য একজন কেউ বলল, "হ্যালো, মিঃ রায়চৌধুরী। ডু ইউ রেকগনাইজ মী?"

কাকাবাবু সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন একটা খুব উঁচু চেয়ারে একজন সাহেব বসে আছে, আগাগোড়া কালো রঙের পোশাক পরা। এর মুখে কোনো মুখোশ নেই। মাথার চুলগুলো টকটকে লাল। তার গলায় ঝুলছে একটা সোনার হার, তাতে ঝুলছে একটা লকেট। লকেটটা আর কিছুই না, মানুষের দাঁতের চেয়েও অনেক বড় একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

কাকাবাবু প্রথমে ভাল করে দেখতে পেলেন না। তাঁর দু' চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। সন্তুকে যে তিনি এত ভালবাসেন, সেটা আগে তেমন ভাবে বোঝেননি। অনেক দুঃখ-কষ্টেও তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে না। লোকজনের সামনে কাঁদবার মতন মানুষই তিনি নন। কিন্তু এখন তিনি চোখের জলও মুছতে পারছেন না, মুখোশধারীরা তাঁর হাত পেছন দিকে মুড়ে চেপে ধরে আছে।

তিনি ঘৃণার সঙ্গে বললেন, "তোমায় চিনব না কেন? তুমি কেইন শিপটন। আমার ভাইপোকে তোমরা মেরে ফেলেছ। এইটুকু একটা ছেলেকে মারতেও তোমাদের দ্বিধা হয় না? তুমি এতবড় খুনি? ছিঃ!"

কেইন শিপটন হা-হা করে হেসে উঠল।

কাকাবাবু আবার বললেন, "তোমার বাবাকে আমি চিনতুম। কতবড় লোক ছিলেন তিনি, তাঁর ছেলে হয়ে তোমার এই কান্ড! আমি তোমার সম্পর্কে সব খবর নিয়েছি। অল্প বয়েস থেকেই তোমার হঠাৎ বড়লোক হবার শখ। সেইজন্যই তুমি একবার ভাড়াটে সৈন্য হয়ে আফ্রিকার কঙ্গোতে নিরীহ লোকদের খুন করতে গিয়েছিলে। তারপর এক এভারেস্ট-অভিযাত্রী দলের সঙ্গে মিশে এখানে এসেছিলে। মিথ্যে মিথ্যে ইয়েতির গল্প রটিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিলে একদিন। এখানে তুমি কোনো বিদেশী গুপ্তচর সংস্থার হয়ে কাজ করছ। আমি সব বুঝেছি। তা বলে ঐটুকু একটা ছেলেকে মেরে ফেললে, তোমার কি বিবেক বলে কিছুই নেই? ওর বদলে তো তুমি আমাকে মারতে পারতে! আমিই তোমার আসল শত্রু!"

কেইন শিপটন হাত তুলে বলল, "অনেক কথা বলেছ, এবার থামো রায়চৌধুরী। তোমার এই ভাইপো টেরিবল কিড। আজ পর্যন্ত কেউ যা পারেনি, এমন-কী তুমিও পারোনি, ও তাই পেরেছে। ও আমাদের এই মাটির নীচের বাঙ্কারে ঢোকার দরজা আবিষ্কার করে ফেলেছে। ওর আর বেঁচে

থাকার কোনো অধিকার নেই।"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "যাক, তবু ওর মৃত্যু বিফলে যায়নি। ও দেশের কাজ করার জন্য মরেছে। ও যখন দরজা আবিষ্কার করে এখানে ঢুকেছে, তখন বাইরে কোনো চিহ্ন রেখে এসেছে নিশ্চয়ই। বাইরে থেকে সাহায্য আসবে, তোমরা সবাই ধরা পড়বে!"

কেইন শিপটন বলল, "ডোনট বী টু অপটিমিসটিক, রায়চৌধুরী। দরজা আমরা আবার সীল করে দিয়েছি, বাইরে থেকে আর বোঝবার কোনো উপায় নেই। তা ছাড়া তোমার খেলনাটাও কোনো কাজে লাগবে না।"

কেইন শিপটন এবার হুকুমের সুরে বলল, "আনড্রেস হিম!"

অমনি চার-পাঁচজন মুখোশধারী কাকাবাবুকে ঝাপটে ধরে তাঁর পোশাক খুলে ফেলতে লাগল। বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই বলে কাকাবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাকাবাবুর ওভারকোট ওয়েস্টকোট, সোয়েটার, শার্ট সব খুলে ফেলার পর একেবারে নীচের উলের গেঞ্জির সঙ্গে লাগানো ছোট যন্ত্র দেখতে পাওয়া গেল। মুখোশধারীরা যন্ত্রটা খুলে নিয়ে দিল কেইন শিপটনের হাতে।

কেইন শিপটন সেটা ঘুরিয়ে - ফিরিয়ে দেখে বলল, "হুঁ, কিউট লিটল থিং! শোনো রায়চৌধুরী, তুমি গম্বুজে বসে রেডিও টেলিফোনে যে-সব খবর পাঠাতে, সেই সব খবরই আমরা ইনটারসেপট করেছি। তোমার বুকের এই যন্ত্রটায় মাঝে-মাঝে বিপ-বিপ শব্দ হয়, আর সিয়াংবোচির রিসিভিং সেন্টারে সেটা ধরা পড়ে। তার থেকে তারা জানতে পারে, তুমি কখন কোথায় আছ! তুমি আগে থেকেই এই ব্যবস্থা করে এসেছিলে। কিন্তু এটাও আমরা জানতে পেরে গেছি, সেইজন্যই গত চব্বিশ ঘণ্টা আমরা সমস্ত ওয়েভ লেংথ জ্যাম করে দিয়েছি, তোমার এই যন্ত্রের পাঠানো আওয়াজ কেউ ধরতে পারবে না, বুঝলে? সুতরাং তুমি এখন কোথায় আছ, তা জানার সাধ্য বাইরের কারুর নেই। ক্লিয়ার?"

কাকাবাবু এর উত্তরে সংক্ষেপে বললেন, "আমার পোশাকগুলো ফেরত পেতে পারি? আমার শীত করছে।"

যদিও মাটির নীচে এই জায়গাটা বেশ গরম, তবু মাঝে-মাঝে এক-এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস আসছে যেন কোথা থেকে। কাকাবাবু পোশাক পরতে লাগলেন, মুখোশধারীরা একটু দূরে সরে দাঁড়াল। ওদের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে কাকাবাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন সন্তুকে।

মুখোশধারীরা এসে কাকাবাবুকে আবার ধরে ফেলার আগেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। সন্তুর গা গরম। কোনো মরা মানুষের গা এরকম গরম হয় না।

কেইন শিপটন বলল, "হ্যাঁ, এখনো বেঁচে আছে। ছেলেটি ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে-সঙ্গে ওকে ঘুমের ওষুধের ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়েছে, যাতে ও এখানকার কিছুই দেখতে না পায়, কিম্বা বুঝতে না পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "ধন্যবাদ। তবে ওকে ঐ রকম হাত-পা-ছড়ানো অবস্থায় শুইয়ে রেখেছেন কেন? দেখলেই মনে হয় যেন এক্ষুনি ওর পোস্ট মর্টেম করা হবে।"

কেইন শিপটন বলল, "ওর ভাগ্য এখন আপনার হাতে নির্ভর করছে। ওকে আমরা মেরে ফেলতে পারি অথবা ওপরে নিয়ে গিয়ে এই অবস্থায় শুইয়ে রেখে আসতে পারি, এখানকার কথা ওর কিছুই মনে থাকবে না।"

কাকাবাবু খুব তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে লাগলেন। সন্তু এখানে একা এল কী করে? সন্তু যে এখানকার গুপ্ত দরজাটা আবিষ্কার করে ঢুকে পড়েছে, তখন আর কেউ সন্তুকে দেখেনি? সন্তু একা ছিল? রানা, ভার্মা, মিংমা—ওরা সব কোথায় গেল? এরা যদি সন্তুকে একা-একা ওপরে শুইয়ে রেখে আসে এরকম অবস্থায়, তা হলেও কি সন্তু বাঁচবে? এখন দিন না রাত তা বোঝার উপায় নেই। যদি রাত হয়, তা হলে বাইরে ঠান্ডায় সন্তু জমে যাবে।

উত্তরে তিনি বললেন, "আমার ওপর নির্ভর করছে মানে? এই ছেলেটিকে বাঁচাবার বদলে তোমরা আমার কাছ থেকে কী চাও?"

কেইন শিপটন বলল, "আমাদের এখানকার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আর দু' মাসের মধ্যে আমরা এ-জায়গাটা ছেড়ে চলে যাবো।

যন্ত্রপাতি সব বসানো হয়ে গেছে, এই সব যন্ত্র এখন নিজে থেকেই চলবে।”

কাকাবাবু পেছন ফিরে একবার তাকালেন। কাছেই একটা জায়গা গোল ভাবে রেলিং দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বেশ গভীর গর্ত-মতন আছে। সেখান থেকে আবছা নীল রঙের আলো উঠে আসছে, আর হালকা ধোঁয়া ভাসছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কিসের যন্ত্রপাতি? গুপ্তচরের কাজের জন্য নিশ্চয়ই! তোমরা কোন দেশের হয়ে কাজ করছ?”

“সেটা তোমার জানবার দরকার নেই। হ্যাঁ যা বলছিলাম, দু’ মাস পরে আমরা এখান থেকে চলে যাব, শুধু একজন লোক এখানে থাকবে। সেই লোকটি কে বলো তো? তুমি!”

“আমি?”

“হ্যাঁ। তোমাকে আর আমরা ওপরে উঠতে দিতে পারি না। তুমি বড্ড বেশি জেনে গেছ। তোমাকে আমরা খেতে না দিয়ে আস্তে-আস্তে মেরে ফেলতে পারি, অথবা তুমি যদি আমাদের হয়ে কাজ করতে রাজি থাকো, সেটা তোমার পক্ষেই ভাল। খাবার-দাবার এখানে সবই পাবে, বেশ আরামেই থাকবে। তিন-চার মাস অন্তর-অন্তর আমাদের লোক এসে তোমার যা-যা দরকার, সব দিয়ে যাবে। শুধু একটা কথা, জীবনে আর কখনো তুমি ওপরে উঠতে পারবে না।”

“তুমি মূর্খের মতন কথা বলছ, কেইন শিপটন। ধরো আমি তোমাদের কথায় রাজি হলুম, তারপর তোমরা এখান থেকে চলে গেলেই তো আমি এখানকার সব যন্ত্রপাতি ভেঙে ফেলতে আরম্ভ করব। জেনেশুনে আমি বিদেশী গুপ্তচরদের সাহায্য করব? কিসের জন্য? টাকা? আমি যদি আর-কোনোদিন ওপরে উঠতে না পারি, তা হলে টাকা দিয়ে আমি কী করব?”

“রায়চৌধুরী, এখানকার যন্ত্রপাতি ভাঙবার সাধ্য তোমার নেই। এখানে এমন যন্ত্র আছে, যা ছোঁয়া মাত্র তুমি মরে যাবে!”

“কোনো নিউক্লিয়ার ডিভাইস?”

“আমি ভেবেছিলাম, তুমি সেটা আগেই বুঝবে।”

“বুঝিনি তবে সন্দেহ করেছিলাম। এখানে যে বিদেশী গুপ্তচরচক্র খুব বড়



রকমের একটা কিছু কারবার করছে, এই সন্দেহের কথা আমি ভারত সরকার আর নেপাল সরকারকে বারবার জানিয়েছি। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করেনি।”

“সেইজন্যই তুমি একটা ঐ পিকিং-দাঁত সঙ্গে নিয়ে ইয়েতি কিংবা প্রি-হিস্টোরিক ম্যানের সন্ধানের ছুতো করে এখানে এসেছিলে।”

“সেরকম একটা দাঁত তো তুমিও গলায় ঝুলিয়ে রেখেছ!”

“এতে সৌভাগ্য আছে। এটা গলায় ঝোলাবার পর থেকে আমি আর কোনো কাজে ব্যর্থ হইনি।”

“নিছক কুসংস্কার। তোমার মতন সাহেবরাও কুসংস্কার মানে। আমার কিন্তু এখনো বিশ্বাস, এই রকম দাঁতওয়ালা আদিম-কালের কিছু মানুষ এখনো এদিকে কোথাও আছে। কোনো গহন-দুর্গম অঞ্চলে।”

“তাদের খোঁজে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেই পারতে। আমাদের ব্যাপারে নাক না-গলালে তোমাকে এই বিপদে পড়তে হ'ত না। যাই হোক, শোনো। আমরা চলে যাবার পরেও যে এখানে কোনো লোক রাখার দরকার আছে তা নয়। তোমাকে এই প্রস্তাব দিচ্ছি, তার কারণ, এটাই তোমার বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। তুমি আমাদের সাহায্য না করলে, আমরা তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব কেন?”

“আমাকে মৃত্যু-ভয় দেখিও না, কেইন শিপটন্। একজন সাধারণ মানুষের জীবনে যত ঘটনা ঘটে, আমার জীবনে অন্তত তার দশগুণ বেশি ঘটনা ঘটেছে। সেই হিসেবে আমি দশবার বেঁচে আছি। এখন যে-কোনো দিন আমার মৃত্যু হলেও আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি তোমাদের পরিষ্কার জানিয়ে রাখছি, আমার শেষ নিশ্বাস থাকা পর্যন্ত আমি চেষ্টা করব তোমাদের ধরিয়ে দেবার। আমার ওপরে তোমরা যতই অত্যাচার করো, তবু তোমাদের মতন ঘৃণ্য গুপ্তচরদের আমি কোনো সাহায্যই করব না! তবে—”

“আরও কিছু বলবে? আজকে আমরা সবাই এখানে বেশ ছুটির মুডে আছি, তাই তোমার এই সব লম্বা-লম্বা লেকচার শুনছি। অন্য দিন আমরা এই সময় খুব কাজে ব্যস্ত

ছোটদের যত সেরা বই



সত্যজিৎ রায় ফেলুদা-সিরিজের উপন্যাসে অদ্বিতীয়, প্রোফেসর শঙ্কুর কান্ডকারখানার বর্ণনায় তুলনাহীন, এ যেমন সত্যি, তেমনই তাঁর 'ফটিকচাঁদ' উপন্যাসটি যে এক অসাধারণ কীর্তি এতেও কোনো সন্দেহ নেই। ছোট্ট একটি বছর বারোর ছেলে, জঙ্গলের মধ্যে রাস্তার ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। সারা দেহে তার জখমের চিহ্ন। জ্ঞান ফিরল একসময়ে, কিন্তু স্মৃতি ফিরল না। নিজেই একটা নাম বানিয়ে নিল সে—ফটিকচাঁদ পাল। সেই স্মৃতিভ্রষ্ট ছেলেটির স্মৃতি হারানো এবং স্মৃতি ফিরে পাওয়ার এক দারুণ রোমাঞ্চকর কাহিনী 'ফটিকচাঁদ।' প্রচ্ছদ ও ইলাসট্রেশন—সত্যজিৎ রায়েরই।



বিমল মিত্র একটি চমক-জাগানো রূপকথা-কাহিনী লিখেছেন তোমাদের জন্য। সে-কাহিনীর নাম — 'রাজা হওয়ার ঝকমারি।' বোম্বাগড়ের রাজা একটা অদ্ভুত শর্ত রাখলেন দুই ছেলের সামনে। বললেন যে, মাত্র ছ' মাসের মধ্যে যে-ছেলে পৃথিবীর সব-থেকে বোকা লোকটিকে খুঁজে আনতে পারবে, তাকেই তিনি তাঁর সিংহাসনে বসাবেন। এই শুনে দুই ছেলে দেশান্তরে বেরিয়ে পড়ল বিশ্ববোকাকে খুঁজে বার করতে। কিন্তু খুঁজে বার করা কি মুখের কথা? সে যে কী ঝকমারি ব্যাপার—তাই নিয়েই গল্পের রাজা বিমল মিত্র লিখেছেন এই দারুণ উপভোগ্য উপন্যাস।

সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য-উপন্যাস : বাদশাহী আংটি ৬ গ্যাংটকে গন্ডগোল ৬ সোনার কেল্লা ৬ বাক্স-রহস্য ৫ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৬ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫ জয়বাবা ফেলুনাথ ৬ ফেলুদা এন্ড কোং ৮ গোরস্থানে সাবধান ৮ **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ভয়ঙ্কর সুন্দর ৫ সত্যি রাজপুত্র ৫ তিন নম্বর চোখ ৫ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৬ সবুজ দ্বীপের রাজা ৫ ডুংগা ৭ জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ ৮ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৬ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬ সমগ্র কিশোর সাহিত্য (১ম) ২০ **প্রেমেন্দ্র মিত্রের** আগ্রা যখন টলমল ৫ যাঁর নাম ঘনাদা ৫ ঘনাদার ফুঁ ৬ তেল দেবেন ঘনাদা ৬ **শৈলেন ঘোষের** অরুণ বরুণ কিরণ-মালা ৩ মিতুল নামে পুতুলটি ৪ ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬ বাজনা ৬ হুম্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫ আমার নাম টায়রা ৫ আজব বাঘের আজগুবি ৭ **হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের** ভয়ের মুখোশ ৬ পাথরের চোখ ৬ সীমানা ছাড়িয়ে ৬ পাঁচ মুণ্ডির আসর ৬ **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের** ভূমিকম্পের পটভূমি ৪ **ইন্দ্রমিত্রের** বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫ শরৎ কথামালা ১০ **সত্যজিৎ রায়ের** প্রোফেসর শঙ্কুর আজব অ্যাডভেনচার : প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৬ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬ মহাসংকটে শঙ্কু ৬ **পূর্ণেন্দু পত্রীর** কী করে কলকাতা হলো ৪ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪ **শঙ্করীপ্রসাদ বসুর** আমাদের নিবেদিতা ৬ **গিরিধারী কুণ্ডুর** টংসা চু ৫ **বিমল মিত্রের** রাজা হওয়ার ঝকমারি ৮ **শিশিরকুমার মজুমদারের** তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫ **অন্নদাশংকর রায়ের** হৈ রে বাবুই হৈ ৫ **মঞ্জিল সেনের** ডাকাবুকো ৫ **রেবন্ত গোস্বামীর** অরুমিতুদের কথা ৪ **সুবোধ ঘোষের** সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৫ **সত্যজিৎ রায়ের** নানা স্বাদের কাহিনী : এক ডজন গপ্পো ১০ আরো এক ডজন ১০ ফটিকচাঁদ ৮ **শিবরাম চক্রবর্তীর** হর্ষবর্ধর নিত্যনূতন ৪ শিব্রামের বারো আড়ি ৫ দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৬ **পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের** মাধুরীলতার চিঠি ৫ **নারায়ণ চক্রবর্তীর** হলদে সবুজ কৃষ্ট্যাল ১০ **সমরজিৎ করের** একটি সংকেতের জন্যে ৬ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** তপন চরিত ৬ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** গোসাই-বাগানের ভূত ৮

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

থাকি। তবে কী?"

"আমি চাই, এই ছেলেটি বেঁচে থাক। আমার ভাইপো সন্তু, ওর এত কম বয়েস...... অবশ্য দেশের কোনো কাজ করতে গিয়ে যদি মরে যায়, তাতে দুঃখ নেই। তোমরা আমাকে এখানে আটকে রাখতে চাও রাখো, কিন্তু ওকে ছেড়ে দাও।"

"কিন্তু তুমি তোমার খোঁড়া পা নিয়েই কারুকে লাথি মারবে, কারুর গলা টিপে ধরবে, এসব ঝামেলা তো আমরা বারবার সহ্য করব না। তুমি যদি আমাদের সাহায্য করতে রাজি না থাকো, তা হলে তোমার হাত-পা শিকল দিয়ে বেঁধে এক জায়গায় ফেলে রাখা হবে।"

"তাই রাখো। কিন্তু এই ছেলেটিকে অজ্ঞান অবস্থায় বাইরে ফেলে রেখে এলে ও বাঁচবে কী করে? তুষারপাত হলেই তো মারা যাবে।"

"সেটা ওর ভাগ্য। বাঁচতেও পারে, মরে যেতেও পারে। ও যেখানে শুয়ে থাকবে, তার পাশে দেখা যাবে ইয়েতির কয়েকটা পায়ের ছাপ। ও যদি কোনো গুহার গল্পও বলে, তা হলে অন্যরা ভাববে সেটা ইয়েতির গুহা। ইয়েতিই ওকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।"

এই সময় কাকাবাবুর চোখ চলে গেল সন্তুর দিকে। সন্তুর চোখের পাতা দুটো যেন কেঁপে উঠল দু' একবার। একটা হাত পাশে ঝুলছিল, সেটা আস্তে বুকের ওপর রাখল।

কেইন শিপটনও এই ব্যাপারটা দেখে ফেলেছে। সে অমনি ব্যস্ত হয়ে বলল, "কুইক, কুইক, ইঞ্জেকশান দাও! দা কিড মাস্ট নট সি হিজ আঙ্কল হীয়ার।"

দু'জন মুখোশধারী ছুটে গেল একটা ঘরের মধ্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ নিয়ে বেরিয়ে এল।"

সন্তু এবার একটু পাশ ফিরে কাতর ভাবে শব্দ করল, আঃ! তখনো তার চোখ বোজা।

কেইন শিপটন অন্য মুখোশধারীদের বলল, "শিগগির রায়চৌধুরীকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও!"

তারা কাকাবাবুকে আবার চেপে ধরতেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "না, ওকে আর ইঞ্জেকশান দিও না!" (ক্রমশ)

শিশু রঙ্গন



মঞ্চের পর্দা উঠতেই ওরা গান গেয়ে উঠল, খুশিতে ভরা ফুলের মতো এক গুচ্ছ ছোট্ট ছেলেমেয়ে:

আমাদের এই হাসি-খুশি
হাজার মজার অঙ্গনে,
এসো সবাই দল বেঁধে আজ
এসো খুশির রঙ্গনে।

হ্যাঁ, আমরা সবাই গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, সত্যিই হাসি-খুশি-ভরা এই শিশু রঙ্গন। ছোটদের ছোট্ট প্রতিষ্ঠান। সেদিন ভারত মহাসভা হলে ছিল ওদের পুরস্কার বিতরণী উৎসব। প্রায় দুশোটি পুরস্কার নিল তারা তাদের সভাপতির হাত থেকে। কেউ পেল আবৃত্তি করার জন্য, কেউ পেল ছবি আঁকায়, কেউ বা অভিনয়ে। এমন-কী বাদ গেলেন না মায়েরাও।

শিশু রঙ্গনের শিশুরা আমাদেরও সেদিন উপহার দিল শৈলেন ঘোষের লেখা একটি নাটিকা, 'দত্যিদানার ছানা'। ভেড়া, ইঁদুর, বেড়ালের সঙ্গে ছোট্ট মেয়ে ঝুনুঝুনু আর দত্যিছানার সে এক মজার কাণ্ড।

শব্দ-সন্ধান

১		২	■	৩		৪
	■	৫	৬		■	
	■	■		■	■	
■	৭				৮	■
৯		■		■	১০	
■		■		■		■
১১			■	১২		

সংকেত : পাশাপাশি : ১। ধর্মনেতা, আবার শাসনকর্তাও। ৩। প্রবাদ আছে, এই পাখি নাকি জ্যোৎস্না পান করে। ৫। জলাশয় বা খাদের বিশেষণ। ৭। বিখ্যাত কোন্ রাজর্ষির সঙ্গে অকর্মাদের তুলনা করা হয়? ৯। হাতে থাকলে নিধিরাম সর্দার হওয়া যায় না। ১০। ইংরেজি প্রবাদ আছে, এই নগরী একদিনে তৈরি হয়নি। ১১। মৃগয়া। ১২। পরাধীন ভারতের বিশিষ্ট নেতা, ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর কপালে স্থান করে নিয়েছেন।

উপর-নীচ : ১। ঠিক মাথার উপরের আকাশবিন্দু। ২। আবীর। ৩। নদীরও থাকে, রাজারও থাকে। ৪। মেখলা। ৬। বিখ্যাত বাঙালি কুস্তিগির। ৭। যে-নদীর নামের শেষাংশ একটি দেশের রাজধানী। ৮। নিধিরাম সর্দারের হাতে এটাও নেই।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

জ	ল	দ	■	জি	লি	পি
ল	■	হ	ব	ন	■	ং
পা	ন	■	■	■	ছা	প
ই	য়া	ং	সি	কি	য়া	ং
■	ন	■	ন্ধু	■	ম	■
খে	জু	র	■	পা	ন্ড	ব
লা	লি	মা	■	কা	প	ড়

ধাঁধা

নতুন যে-কোনো কিছুতে ছোটকার দারুণ উৎসাহ।

আজ কদিন ধরেই দেখছি, ছোটকার ঘরে দু-তিন প্যাকেট তাস। ছোটকাকে তাস খেলতে বড়-একটা দেখি না। হঠাৎ তাসে এত ভক্তি এল কেন, কে জানে।

ছোড়দির কাছেই শেষ পর্যন্ত খবর পাওয়া গেল। খেলা নয়, আসলে তাসের কিছু ম্যাজিক শিখছে ছোটকা। কোথা থেকে একটা মোটাসোটা বই যোগাড় করেছে। সেই বই পড়ে, আর তাস সাজিয়ে সাজিয়ে ম্যাজিক শিখে রাখে। ছোড়দি নাকি



একদিন চা দিতে গিয়ে ছোটকাকে ধরেছিল। কিন্তু কিছুতেই ম্যাজিক দেখাতে রাজি হয়নি ছোটকা। বলেছে, এখন শুধু শিখছি। দেখাব ভাল করে শিখে।

দেখাবার হলে ছোটকা যে নিজেই ডেকে দেখাবে আমাদের এতে অবশ্য সন্দেহ নেই। ছোটকার স্বভাবটাই ওইরকম। নিজে পুরো তৈরি না হলে কিছুতেই উৎসাহ পায় না অন্যের সামনে কিছু হাজির করতে। সে জন্য আমি কিছু বলব না ঠিক করেছিলাম।

কিন্তু তাস শেষ পর্যন্ত অন্যভাবে এল আমার কাছে। ধাঁধার চেহারায়। ছোটকার দেওয়া প্রথম ধাঁধাটা তাস নিয়েই। দ্যাখো তো, উত্তর বলতে পারো কিনা।

প্রথম ধাঁধা ॥ তিনটে তাস টেবিলে রয়েছে। ইশকাপনের বাঁ দিকে রয়েছে একটি রুইতন। বাঁ দিকে মানে গায়ে গায়ে—এমন না-ও হতে পারে। রাজার ডান দিকে রয়েছে আট-ফোঁটাঅলা একটি তাস। হরতনের বাঁ দিকে রয়েছে একটি দশ-ফোঁটার তাস। ইশকাপনের বাঁ দিকে রয়েছে হরতনের তাস।

তাস তিনটের পরিচয় ও পর পর কীভাবে সাজানো রয়েছে বলতে হবে।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ মনোরমা মায়ের নাম, সুরমা মেয়ের। এখনকার বয়সের অঙ্ক-দুটোকে জায়গা বদল করালে মায়ের বয়স পায় মেয়ে, মেয়ের বয়সি হন মা। এক বছর আগে মনোরমার বয়স ছিল সুরমার তখনকার বয়সের দ্বিগুণ।

এখন কার কত বয়স?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ উপযুক্ত সংখ্যা বসাও :

৫ ২০ ৬ ২৪ ৭ ২৮ — —

চতুর্থ ধাঁধা ॥ বেমানান কোনটি?

অটবী, বিপিন, কানন, কুসুম, অরণ্য

গতবারের উত্তর ॥ ১। অধিপ বাবলিকে চকোলেটের বাক্স দিয়েছে, সুতরাং বাবলি অধিপের আপন বোন নয়। প্রদীপ সুদীপের বোনকে দিয়েছে, সুতরাং বাবলি সুদীপের বোনও নয়, সুতরাং বাবলির আপন দাদা প্রদীপ। সুদীপের বোন পিয়ালি নয়, বাবলিও নয় জানা গেল। রইল লালি। সুতরাং লালির দাদা সুদীপ, অধিপ তাহলে পিয়ালির দাদা। ২। প্রশ্নের মধ্যেই লুকনো ছিল উত্তর। সাজিয়ে দ্যাখো, 'মানে বোঝা সোজা' হয় কিনা। ৩। সোয়া তিনটে। ৪। ৭ (প্রতি লাইনের যোগফল ১৫)।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো



সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল পরপর সাজিয়ে রাখা বস্তার ফোটো

ফোটো তপন দাস

উত্তর বটে

প্রঃ রোগা হবার জন্যে একশো পিল্-এর একশিশি ওষুধ কিনতে বললেন, দিনে ক'বার ক'টা করে খাব বললেন না তো?

উঃ খেতে হবে না, দিনে তিনবার শিশিসুদ্ধ ওষুধ মেঝেতে ছড়িয়ে ফেলে একটা একটা করে কুড়িয়ে শিশিতে ভরবে।

প্রঃ ভূগোল পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন দিয়েছিল, 'আমরা খাদ্য কোথা থেকে পাই?' কী উত্তর লেখা উচিত ছিল?

উঃ রেশনের দোকান থেকে।

প্রঃ আপনি কি সকালবেলা ব্যায়াম করেন?

উঃ হ্যাঁ, রোজ। ওঠানো, নামানো, ওঠানো, নামানো, এ-রকম কুড়িবার করে, প্রথমে একটা চোখের পাতা, তারপর আর একটা চোখের।

সুসেন

মজার খেলা

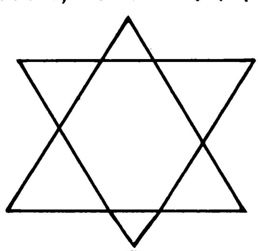
দশটা পয়সাকে কীভাবে সাজানো যায় পাঁচটা লাইনে, আর প্রত্যেক লাইনে থাকে চারটে করে পয়সা—এই মজার খেলাটা গতবার আমরা শিখেছিলাম। মনে পড়ছে?

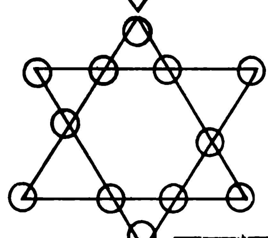
কিন্তু একই বন্ধুদের এই একই খেলা আর কতবার দেখানো যায় বলো। তাই এই ধরনেরই আরেকটি খেলা শিখব এবার।

এই খেলাটায় দশের জায়গায় লাগবে বারোটা এক-রকমের পয়সা। পয়সা বারোটা কোনো বন্ধুর হাতে দাও। এবার তাকে বলো, বারোটা পয়সাকে এমনভাবে ছটি লাইনে সাজাতে হবে যাতে প্রত্যেক লাইনে থাকে চারটি করে পয়সা।

আগেভাগে জানা না থাকলে এই সমস্যারও সমাধান চট করে মাথায় খেলে না। তবে, তোমরা তো আগের নিয়মটা জানো। নিজেরা একটু চেষ্টা করে দ্যাখোই না, পারো কিনা উত্তর বার করতে।

যারা পারবে না তাদের জন্য শিখিয়ে দিচ্ছি নিয়মটা। নীচের ছবির মতো তারা আঁকো। তারপর দ্বিতীয় ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনভাবে বসাও বারোটি পয়সা। দেখবে, ছটি লাইনে কেমন চারটি করে পয়সা বসানো গেল, অথচ চব্বিশটা পয়সা লাগল না, বারোটা দিয়েই হল।





মজারু

হাসিখুশি



মফস্বল শহরের এক রাস্তায় ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকের একজন ভবঘুরে গোছের মানুষকে উবু হয়ে বসে ল্যাম্পপোস্টের আলোয় কিছু খুঁজতে দেখে এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "সেই থেকে কী খুঁজছ তুমি বলো তো?" লোকটি মুখ না-তুলেই বলল, "আজ্ঞে একটা আধুলি হারিয়ে গেছে—" ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "আধুলিটা কি এখানেই পড়েছে?" লোকটি খানিকটা দূরে আঙুল দেখাল। ভদ্রলোক বললেন, "আচ্ছা পাগল তো, পড়েছে ওই গাছ-তলায় আর খুঁজছ এখানে?" লোকটি রেগে গেল—"যা-তা বলবেন না, পাগল আমি না আপনি? গাছতলায় কি আলো আছে যে ওখানে খুঁজব?"



মাধববাবু নতুন কাজের লোককে বললেন, "দ্যাখো বাপু, পর-পর ভাবলে কিন্তু চলবে না, নিজের বাড়ি মনে করে কাজকর্ম করবে।"

পরদিন সকালে অফিস যাওয়ার সময় তিনি দেখেন টেবিল থেকে তাঁর হাতঘড়িটা উধাও। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ—শেষে দেখা গেল নতুন কাজের লোকটি হাতে পরে বসে আছে। মাধববাবু তো রেগে কাঁই। কাজের লোকটি মাথা চুলকে বলল, "এজ্ঞে বাবু, আপনি নিজের বাড়ি মনে করতে বললেন না! আপনি মনিব, আপনার কথা অমান্যি করি কেমন করে।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

মহিন্দরের লাঠি

সুধীন্দ্র সরকার



লাঠিটা দেখতে ছিল সাপের মতো। আঁকাবাঁকা। গায়ে চাকাচাকা দাগ আঁশের মতো। হাতলটা অবিকল সাপের ফণা। আর চোখ দুটোর জায়গায় লাল পুঁতি বসানো।

একদিন মহিন্দর বলল, 'খোকাবাবু, আমার লাঠিটা কিন্তু সত্যি সত্যি লাঠি নয়। এটা একটা সাপ।'

'সাপ!' খুব অবাক হলাম ওর কথা শুনে।

'হ্যাঁ। শঙ্খচূড় সাপ। সাপটা মেরে রোদে শুকিয়ে শক্ত করে নিয়েছি।'

বিশ্বাস হল না মহিন্দরের কথা। ছুঁতে যেতাম লাঠিটা।

মহিন্দর চকিতে লাঠিটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'ছুঁয়ো না। আমি ছাড়া অন্য কারও ছোঁয়া ও পছন্দ করে না।'

মনে মনে হাসলাম মহিন্দরের কথা শুনে। লাঠির আবার পছন্দ-অপছন্দ!

মহিন্দর চোখদুটো গোল-গোল করে বলল, 'মাঝেমধ্যে যখন পুরনো অভ্যেসটা ভুলতে পারে না—ডেকে ওঠে হিস-হিস করে।'

মহিন্দর ওর লাঠিকে নিয়ে প্রায়ই এই-রকম অদ্ভুত সব কথা বলত। আমি অবশ্য তা কোনোদিনই বিশ্বাস করিনি।

মহিন্দরের ডান পা-টা ছিল খোঁড়া। তাই সবসময় সাপলাঠিটা ছিল ওর সঙ্গী। ও খোঁড়া ছিল বটে কিন্তু ওর মতো ড্রাইভার দার্জিলিংয়ে দুটো ছিল না। স্টীয়ারিং ওর হাতে পড়লেই জীপ ছুটত দৈত্যের মতো।

আমার বাবার জীপ চালাত মহিন্দর। জীপ নিয়ে বাবাকে অফিসে পৌঁছে দিত আবার নিয়ে আসত। ছুটিছাটার দিনে মাঝেমধ্যে টুরিস্টদের নিয়ে ছুটত টাইগার হিল কার্সিয়াং কিংবা সন্দকফুর পথে। এগুলো ছিল ওর উপরি রোজগার। জলা-পাহাড়ের ওপর আমাদের বাংলোতে ওর থাকার জন্য যে-ঘরটা ছিল সে-ঘরটা অধি-কাংশ সময় বন্ধ থাকত। ঘরে বেশিক্ষণ

থাকত না ও। ধরতে গেলে জীপটাই ছিল ওর ঘরবাড়ি।

জুন মাসের শেষাশেষি বর্ষা নেমে গেছে দার্জিলিংয়ে। ভোর থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল ঝমঝম করে। মাঝে মাঝে গুমগুম শব্দে ঢল নামছিল দূরের খাদে। জলাপাহাড়ের গা বেয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছিল ম্যালের দিকে।

বৃষ্টি মাথায় করে বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরলেন। ফিরতে বেশ রাত হয়েছে আজ। ওয়াটারপ্রুফ খুলতে খুলতে মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহিন্দর আসেনি? সকালে অফিসে পৌঁছে দিয়েই বেপাত্তা!'

মা বললেন, 'বৃষ্টিতে কোথাও আটকে গিয়েছে হয়তো।'

বাবার চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। বললেন, 'না, ব্যাপারটা একটু জটিল। অফিসে দুজন পুলিস এসেছিল ওকে খুঁজতে।'

'সে কী, কাউকে চাপা দিয়ে পালায়নি তো?' মা বললেন।

'কী জানি!' বাবা বললেন, 'বাড়িতে এলেই ওকে থানায় নিয়ে যাব।'

'তোমাকে আমি কবে থেকে বলছি অন্য ড্রাইভার দেখ। তুমি তো তা শুনবে না। ওর ভাবগতিক কেমন যেন।' উৎকণ্ঠার সুরে মা বললেন।

বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছিল। বেগটা যদিও আগের থেকে কম। পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে মহিন্দরের ঘরটা দেখা যায়। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম জানলার দিকে।

বৃষ্টির ছাটে বাইরেটা ঝাপসা হলেও বাংলোর চারপাশের সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম ম্যালের দোকানগুলো ঝাঁপ বন্ধ করছে। নির্জন রাস্তায় লাইট-পোস্টগুলো প্রহরীর মতো ঠায় দাঁড়িয়ে।

বৃষ্টির ছাটে ঘরের খানিকটা ভিজে গেল। জানলা বন্ধ করতে যাব হঠাৎ একটা গুলির শব্দ হল। গুড়ুম! চমকে উঠলাম। শব্দটা এল অনেক নীচের থেকে।

হঠাৎ দেখি কে যেন আমাদের বাংলোর দিকেই ছুটে আসছে। পাকা সড়ক দিয়ে নয়। লোকটা দৌড়চ্ছিল বেশ জোরে। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে দেখছিল। লোকটা এক লাফে বাংলোর পাঁচিল টপকে

জরদাতঙ্ক

সতীরঞ্জন আদক

খড়দা থেকে জরদা খেয়ে
এল জগাই জানা
গন্ধ কি তার কড়া মিঠে
বলতে আছে মানা।
খক্ খক্ খক্ উঠল কেসে
দেখছি ব্যাপার সব্বোনেশে ;
কাসির চোটে চোখ দুটো তার
হল যে লালপানা,
সেদিন থেকে জরদা খাওয়া
ছাড়ল জগাই জানা।

ছুটে গেল মহিন্দরের ঘরের দিকে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ দরজার তালা খুলে ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে।

আমি ছুটতে ছুটতে বাবাকে খবর দিলাম। ঠিক তখনই আর একটা গুলির শব্দ হল। এবার শব্দটা এল মহিন্দরের ঘরের দিক থেকে।

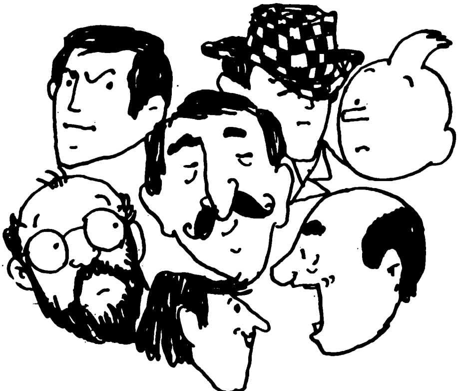
বাবা দ্রুত মহিন্দরের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। পেছনে আমি। মহিন্দরের ঘর তখন যুদ্ধক্ষেত্র। জিনিসপত্র ছড়ানো-ছেটানো। আর, জনাকয়েক পুলিস রিভলভার হাতে এদিক-সেদিক কী যেন খোঁজাখুঁজি করছে।

ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে মহিন্দর। বাঁ পায়ে হাত চেপে ছটফট করছে। মহিন্দরকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ভুত দেখার মতো চমকে উঠলাম আমি। যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে সারা শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছিল ওর।

একটু আগে যে লোকটাকে ছুটে আসতে দেখলাম, সে তাহলে মহিন্দর! এতদিন জানতাম মহিন্দর খোঁড়া। এখন দেখলাম, ও সত্যিকারের খোঁড়া নয়। কিন্তু কেন ও খোঁড়া সেজে থাকত! আর লাঠিটা? লাঠিটা কি লোক দেখানো!

দেখলাম, সাপলাঠিটা পেরেকে ঝুলছে।

একটু পরে মহিন্দরকে ধরে বেঁধে পুলিস ভ্যানে তোলা হল। বাবাও সঙ্গে গেলেন সাক্ষি



আজব মেলা

কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন দেখি গড়ের মাঠে
অনেক লোকের মেলা—
শঙ্কু এবং ফেলুদাতে
চলছে দাবা খেলা।
ঘনাদা যেই সিগারেটের
টিনটি খুলেছেন
কিরীটী রায় সামনে এসে
অমনি জুটেছেন।
জয়ন্ত আর মানিক ছিলেন
একটু দূরেই বসে,
ধাঁধার প্যাঁচে টিনটিনকে
জড়াচ্ছিলেন কষে।
তোপসে একা ঘুরছে দেখে
যেই নিয়েছি পিছু,
জটায়ুদা বললে, "আমার
বই পড়েছেন কিছু?"
লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে
খুঁটছি এলো বেণি,
সামনে এসে উদয় হলেন
পটলডাঙার টেনি।
হঠাৎ শুনে বিকট আওয়াজ
থরথরাল প্রাণ,
গাছ থেকে ভাই সবার মাঝে
ঝাঁপ দিল টারজান।

ছবি দেবাশিস দেব

দেওয়ার জন্যে।

মহিন্দরের ঘরের জানলা খোলা। উত্তরের জানলা। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া হিমালয়ের দিক থেকে ছুটে আসছিল হু-হু করে।

লাঠিটা হাওয়ায় দুলছিল। অনেকদিনের ইচ্ছে সাপলাঠিটা হাতে নিয়ে দেখা, তাই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলাম না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম লাঠির দিকে।

সাধারণ একটা লাঠি। কাঠ কেটে তৈরি। তবে আকৃতিটা সত্যিই সাপের মতো। হাতলটা ফণার আকারে কেটে ডিজাইন করা। লাঠির গায়ে ছুরি দিয়ে চাকা-চাকা আঁশের মতো খোদাই করা।

হাত বাড়িয়ে নিতে গেলাম লাঠিটা। কিন্তু ছুঁতে গিয়েই মনে পড়ল মহিন্দরের সাবধান-বাণী। মনে হল, সারা ঘরটা গম-গম করছে মহিন্দরের কথাতে—'ছুঁয়ো না। আমি ছাড়া অন্য কারও ছোঁয়া ও পছন্দ করে না।'

সারা গা-হাত-পা থর-থর করে কেঁপে উঠল আমার। দেখলাম, লাঠিটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠছে। মরা শঙ্খচূড় সাপের বোধহয় ঘুম ভাঙছে।

পা দুটো ভারী হয়ে উঠল। কাঁটা দিল গায়ে। স্পষ্ট দেখলাম, লাঠির বদলে একটা সাপ পেরেকে ঝুলছে। সাপটা হঠাৎ লম্বা হতে হতে মাটিতে লেজ ছোঁয়াল। লেজে ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে ফণা দোলাতে লাগল। মাঝে মাঝে চেরা জিভ বার করছিল। আর হিস-হিস শব্দ করছিল মুখে। ওর চোখ দুটো দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছিল লকলকে আগুন। মনে হল, সাপটা বুঝি এক্ষুনি ছোবল বসাবে।

আমার বুক দ্রুত ওঠানামা করতে শুরু করল। গলা শুকিয়ে কাঠ। চিৎকার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললাম। কানের মধ্যে একটানা বাজছিল সাপের হিস-হিস ডাক।

পা টলতে লাগল। চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল আমার। এর পর আর কিছু মনে নেই।

মায়ের মুখে পরে শুনেছিলাম, অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে মহিন্দরের ঘর থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। আর সাপলাঠিকে সেই রাত্রেই পাঠানো হয়েছিল থানায়। কেননা, ওর পেটের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল বেশ কিছু দামি হিরে, যার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা।



খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ৪০ ॥

প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে আমার শেষ খেলায় শেষ গোলটি পেয়েছিলুম ফুটবলে মাথা ঠেকিয়ে। ফুটবলের পরিভাষায় বলা উচিত, গোল করেছিলুম হেড করে।

ফুটবল পায়ের খেলা বলেই তো নাম ফুটবল। মাথারও খেলা। বিশেষ করে মগজের। মাথার বাইরের খেলায়, মানে হেড করায়, আমার ছিল দুর্বলতা। হেডে গোল পেয়েছি কালেভদ্রে। কিন্তু কম্পিটিটিভ ম্যাচে ফুটবলে মাথা ঠেকিয়ে শেষ গোলটি করে খুশিতে মন ভরে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, ফুটবলকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নেওয়াই ছিল আমার ফুটবল-জীবনের বিধিলিপি। কোন ম্যাচে কীভাবে গোল করেছিলুম পরে লিখছি।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, ইদানীং ক্রিকেটের কথাই আমি বেশি করে লিখছি। ক্লাবের কর্মকর্তারা চাইছিলেন, আমি যেন আরও দু-চার বছর পুরোদমে ফুটবল খেলি। কিন্তু, ক্লাবের ফুটবল ম্যাচ তেমন করে আমাকে আর টানতে পারছিল না। কেবলই সংকল্পের কথা মনে হত। মনে হত অনেক তো খেললুম। আর নয়। নতুন নতুন খেলোয়াড় উঠছে। তাদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে অবসর নেওয়াই ভাল।

কিন্তু আমার এই একটি পজিশনে কজন খেলার সুযোগ পাবে? মনে হত, দু-একজনও যদি পায়, তারা এই ভেবে খুশি হবে যে, চুনীদা তাদের পথ আগলে রাখেনি।

সত্যিই ষাটের দশকের শেষ দিকে এবং ফুটবল থেকে আমার বিদায়ের মুখে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলারকে ভাল খেলতে দেখে আমার খুবই আনন্দ হত।

দু-এক বছর আগে - পরে দারুণ প্রতিশ্রুতি নিয়ে কলকাতায় এসেছিল হাবিব, নাইম, শ্যাম থাপা সি প্রসাদ প্রমুখ বাইরের খেলোয়াড়। কলকাতার খেলোয়াড়দের মধ্যে সুনীল ভট্টাচার্য, সুভাষ ভৌমিক ও সুধীর কর্মকার তখন রাইজিং স্টার। কলকাতা ফুটবলের রমরমা ও আমেজ এরা জিইয়ে রেখেছে দীর্ঘদিন। সময়ের মরচে পড়ে ধার কমে গেলেও এখনও কারও কারও ভার কম নয়।

হায়দরাবাদের হাবিব ও নাইম এক সময় ম্যাচ-উইনার খেলোয়াড় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এত ভাল খেলত যে, ফুটবল মহলের অনেকে মনে করতেন, ওরা যে দলে যাবে সেই দলই লীগ-শীল্ড পাবে। হাবিবের মতো এত দিন ধরে কম খেলোয়াড়ই খেলেছে। হাবিবের কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ল।

দল বদলের জন্য হাবিব উপস্থিত হয়েছে আই এফ এ অফিসে। ফুটবলের অনুরাগী মহলে বাতাসের আগে রটে গেছে খবরটা।

মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সমর্থকদের ভিড়ে আই এফ এ অফিসের আশপাশ গিজ-গিজ করছে। সকলে অবাক হয়ে দেখল, দৈত্যের মতো এক বিরাট পুরুষ একটি ছেলেকে পাঁজাকোলা করে আই এফ এ অফিস থেকে বেরিয়ে আসছে। তারপর ওইভাবেই ওকে নিয়ে গিয়ে ঢোকাল এক মোটরগাড়ির মধ্যে। বিরাট পুরুষটি কে জানো? থঙ্গরাজ। আর কোলের ছেলেটি হাবিব। ছোটখাটো চেহারা তো! ফুটবল খেলোয়াড়দের দল-বদলের সময় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বেশ কিছু সমর্থক পরিচিত মোহনবাগান ক্লাব সমর্থকদের সঙ্গে দেখা হলে রসিকতা করে বলত, "চেষ্টা করলে ভগবানকেও খুঁজে পাবে, কিন্তু হাবিবকে পাবে না।"

আমার মনে হয়, আমেদ খাঁর পরে বাইরের আর-কোনো ফুটবলার বোধহয় হাবিবের মতো জনপ্রিয় হয়নি!

হাবিবের সঙ্গে আর যাদের নাম করেছি, কলকাতার ফুটবলকে তারা অনেক সমৃদ্ধ করেছে। ভারতের ফুটবলকেও। ওদের খেলার গুণেই তো সত্তরের এশিয়ান গেমসে ভারত পেয়েছিল ব্রোঞ্জ পদক। আন্তর্জাতিক ফুটবলে তারপর এই আশি সাল পর্যন্ত আর কিছু জোটেনি আমাদের কপালে।

নাইম, হাবিবের কথাই বলো—আর শ্যাম

থাপা, সুভাষ ভৌমিকের কথাই বলো—যখন যে-ক্লাবে তাঁরা খেলেছেন, খেলেছেন জান দিয়ে এবং বুদ্ধি খাটিয়ে। তবে সুভাষের খেলায় যেন চটক বেশি ফুটেছে, যখন খেলেছে লাল হলুদ জার্সি পরে। কারও আন্তরিকতায় আমি অবশ্য কণামাত্র কটাক্ষ করছি না। মোহনবাগানের ম্যাচ-উইনার হিসাবেও সুভাষের ভূমিকা তারিফ করার মতো। শ্যাম থাপা সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। ইস্ট-বেঙ্গল ও মোহনবাগানের বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিয়েছেন একা শ্যাম। শ্যামের ট্রাম্প-কার্ড হল ওঁর অসাধারণ বাঁড ফ্লেক্সিবিলিটি। হাবিবের ট্যালেণ্ট ও স্কিল সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তবে ওর বোধহয় সব চেয়ে বড় গুণ—লাল-হলুদ, সবুজ-মেরুন, কিংবা সাদা-কালো—যে জার্সিই পরুক না কেন—সব জার্সির মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণপণ লড়াই করেছে। সুনীল ভট্টাচার্যের জন্য বড় দুঃখ হয়। ব্যাকে খেলত বাঘের মতো। হাঁটুতে চোট পেয়ে, অসময়ে ফুটবল থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হল।

আমার সেই শেষ খেলাটির কথাই আগে বলে নিই। আটষট্টি সালের কথা। বাধ্য হয়েই লীগের একটি মাত্র ম্যাচ খেলতে হয়েছিল। খেলাটি ছিল স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে। চুয়ান্ন সালে আমার জীবনের প্রথম লীগ ম্যাচে যেমন গোল পেয়েছিলুম, ওই শেষ ম্যাচেও তেমন গোল পেলুম। আরও মিল দ্যাখো, প্রথম গোলটি করেছিলুম ইডেন গার্ডেনের দিকের গোলে। শেষ গোলটিও করলুম ওই-দিকে। কীভাবে করেছিলাম প্রথমেই লিখেছি।

আগের বছর, অর্থাৎ সাতষট্টির মরসুমটি নানা কারণে স্মরণীয়। ওই বছর রাজনৈতিক পালাবদল হয়। কংগ্রেসের বদলে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন যুক্তফ্রনট সরকার। তার ফলে পালাবদল হয় ফুটবলেও। আই এফ এ-র সভাপতি হয়ে স্নেহাংশুকান্ত আচার্য মস্ত পরিবর্তন আনেন। ক্রিকেটের ঐতিহ্য ভেঙে সর্বপ্রথম ফুটবল ম্যাচের ব্যবস্থা করেন ইডেন গার্ডেনে।

তখন মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল মাঠে এত দর্শক-আসন ছিল না। বড় খেলায় টিকিটের হাহাকার উঠত। হাহাকার অবশ্য এখনও ওঠে। তবু তখন দুই মাঠে যত দর্শক খেলা দেখতে পারতেন তার দ্বিগুণেরও বেশি দর্শক খেলা দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন ইডেনে। কম করে ষাট-বাষট্টি হাজার।

বৃষ্টি হলে ইডেনের মাটি অবশ্য ফুটবল খেলার পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম বছর ইস্টবেঙ্গল ও আমাদের মোহনবাগানের লীগের রিটার্ন ম্যাচটি তো বৃষ্টির ফলে হাফ-টাইমে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে খেলা হয় আর একদিন। সাতাত্তরে বৃষ্টি-ভেজা ইডেনে ফুটবলের রাজা পেলেও তো তাঁর খেলা দেখাতে পারেননি। শুকনো থাকলে ইডেন কিন্তু ফুটবলের পক্ষে চমৎকার মাঠ।

যাই হোক সাতষট্টির পুরো মরসুমটাই আমাকে খেলতে হয়েছিল, দু'-চারটি ম্যাচ বাবদ। যে-ম্যাচে খেলিনি, পালা করে খেলেছে সীতেশ দাস ও কাঞ্চন। সীতেশের কথা লিখতে গিয়েই মনটা কেমন করে উঠল। একটু অসাবধানতার ফলে রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দুর্ঘটনা ঘটায় কীভাবে শেষ হয়ে গেল একটি তরতাজা ছেলে। আমার বন্ধু নাটকির কথা আগেই লিখেছি। সীতেশের মৃত্যুও প্রায় ওইভাবে। একই রকমের মর্মান্তিক ঘটনা।

সাতষট্টির মরসুম মোহনবাগানের পক্ষে মোটেই শুভ ছিল না। লীগে হারাতে হয়েছিল বারো পয়েন্ট। মহামেডান স্পোর্টিং, ইস্টার্ন রেল এবং এরিয়ান ছিনিয়ে নিয়েছিল তিনটি করে পয়েণ্ট। তবে, আমাদের চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের পথে আমরা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম আর সর্বভারতীয় ফুটবলে ওই দলের ত্রি-মুকুট জয়ে খুঁত ধরিয়ে আড়াই মুকুট করে দিয়েছিলুম। ইস্টবেঙ্গল রোভার্স ও ডুরাণ্ড জিতেছিল। আই এফ এ শীল্ডে হয়েছিল আমাদের সঙ্গে যুগ্ম জয়ী। সে-বছর লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মহামেডান স্পোর্টিং। দশ বছর পরে মহামেডান দল ওই সম্মান পেয়েছিল। তারপর উনআশি সাল পর্যন্ত অর্থাৎ বারো বছরের মধ্যে আর লীগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি।

আগেই লিখেছি সাতষট্টির লীগে আমরা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিলুম। জুলাইয়ের ত্রিশ তারিখে ইডেনে পালটা লীগের খেলায় মহামেডানের কাছে আমরা ০—১ গোলে

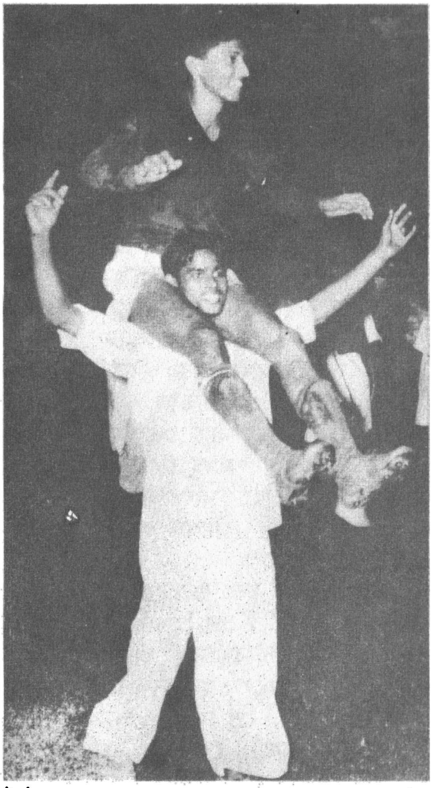
হারার পর একেবারেই খোঁড়া হয়ে গেলুম। লীগ জয় সম্পর্কে সব আশা শেষ হয়ে গেল।

মহামেডান জিতেছিল ২৩ মিনিটে করা সেণ্টার ফরোয়ার্ড পাপ্পানার গোলে। কিন্তু খেলা শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে আমি যে গোলটি করেছিলুম সেটি অফসাইডের অজুহাতে নাকচ না হলে মোহনবাগান অন্তত হারত না। গোলটি প্রথমে গ্রাহ্যই হয়েছিল। অনেক দেরিতে মহামেডান স্পোর্টিং অফসাইডের আবেদন জানায়। গোলটি নাকচ হয়ে গেল। তাই নিয়ে দারুণ হৈ-চৈ। দর্শকরা মাঠে ঢুকে পড়ল। খেলা বন্ধ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আমাদের অধিনায়ক জারনেল সিং হাতজোড় করে সবাইকে বুঝিয়ে মাঠ পরিষ্কার করে দিল। আবার খেলা শুরু হতে-হতেই বাকি এক মিনিট ফুরিয়ে গেল।

তখন লীগের অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, আমরা যদি ফিরতি খেলায় ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে পারি তবে চ্যাম্পিয়ন হয় মহামেডান স্পোর্টিং। আমাদের বিরুদ্ধে জিতলে ইস্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়নশিপ নিশ্চিত। এই অবস্থায় আমাকে নিয়ে আবার কটাক্ষ শুরু হল। ক্লাবের মধ্যে অনেকেই বলাবলি করতে লাগল—"চুনী কিছুতেই গা লাগিয়ে খেলবে না। আমাদের লীগ জয়ের আশা থাকলে তবু খেলত। আমাদের যখন কোনও সম্ভাবনাই নেই, আর জিতলেই যখন ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হবে, তখন কিছুতেই ওই ম্যাচে আমরা সত্যিকারের চুনীকে দেখতে পাব না।"

এই গুঞ্জন যত বাড়তে লাগল, আমার রোখও বাড়তে লাগল তত। জান দিয়ে খেলব, দেখিয়ে দেব, কোনও গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেই আমি হালকাভাবে খেলি না।

আগের রবিবারে আমরা হেরেছিলুম মহামেডানের কাছে। পরের রবিবারের খেলা ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। ছয় আগস্ট। দর্শক-ঠাসা ইডেনে খেলা শুরু হওয়ার পরেই আরম্ভ হল জোর বৃষ্টি। জায়গায়-জায়গায় জল দাঁড়িয়ে গেল। ইডেনের অবস্থা এমন হল যে, ফুটবল খেলা সম্ভব নয়। ফলে হাফ টাইম পর্যন্ত খেলা চলার পরে গোলশূন্য অবস্থায় খেলাটি বন্ধ হয়ে গেল। সেই খেলা আবার হল এক মাসেরও পরে—সেপ্টেম্বরের দশ



ইস্টবেঙ্গল পরাস্ত। মহামেডান ক্লাবের সমর্থক তাই চুনীকে কাঁধে তুলে নিয়েছেন

তারিখে। ততদিনে আই এফ এ শীল্ডের খেলা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু লীগের ফয়সালা হয়নি। উত্তেজনা জিইয়ে রয়েছে। কারা চ্যাম্পিয়ন হবে? ইস্টবেঙ্গল? না, মহামেডান স্পোর্টিং?

একই দিনে অর্থাৎ ওই দশ সেপ্টেম্বরে দুই দলের খেলার ব্যবস্থা হল। মহামেডান স্পোর্টিং তাদের মাঠে শেষ ম্যাচ খেলবে ইস্টার্ন রেল দলের সঙ্গে। ইডেনে শেষ ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল চির-প্রতিদ্বন্দ্বী মোহন-বাগানের সঙ্গে।

ততদিনে ইস্টবেঙ্গল এক পয়েণ্টে পিছিয়ে পড়েছিল। মহামেডানের সাতাশটি খেলায় আটচল্লিশ পয়েণ্ট; সমান খেলায় ইস্টবেঙ্গলের সাতচল্লিশ। সুতরাং কোন মাঠে কী ফল হলে কোন্ দল লীগ-খেতাব পাবে তোমরা আন্দাজ করে নিতে পারছ। এবং বুঝতে পারছ ইস্টবেঙ্গলের কাছে জয়

ছিল জীবন-মরণের প্রশ্ন। ওই বছর ইস্টবেঙ্গল দল হিসেবেও ছিল দারুণ শক্তিশালী। তুলনায় আমরা কিছুটা দুর্বল শুধু ছিলুম না, লীগ জয়ের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাওয়ায় মনের দিক দিয়েও দুর্বল হয়ে পড়েছিলুম।

খেলার দিন আবার সেই কথাগুলি কানে এল—"আমরা তো শেষ হয়েই গেছি, ইস্টবেঙ্গল যেন জিততে না পারে। এই ম্যাচ জিতলে লীগ হারানোর সব দুঃখ ভুলে যাব। দোহাই চুনী, গা লাগিয়ে খেলো।"

গা অবশ্য আমার গরম হয়েই ছিল। সেদিনও ইডেনের মাঠ ভিজে থাকা সত্ত্বেও সত্যিই আমরা গরম ম্যাচ খেলেছিলুম। দুই মাঠেরই দর্শক-সমর্থকদের চোখ ছিল খেলার দিকে, কিন্তু তাঁরা কান খাড়া রেখেছিলেন অন্য মাঠের খবর শোনার জন্য। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি।

দুটি খেলার ফল কী হয়েছিল জানো? মহামেডান-ইস্টার্ন রেল খেলা ছিল গোল-শূন্য। ইডেনে ইস্টবেঙ্গলকে আমরা হারিয়েছিলুম ১—০ গোলে। হ্যাঁ, থঙ্গরাজ, সুনীল ভট্টাচার্য, নাইম, পি সিংহ, পরিমল দে, হাবিব প্রমুখ নামী খেলোয়াড় নিয়ে গড়া ইস্টবেঙ্গলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেই খেলেছিলুম। আমিই করেছিলুম জয়সূচক গোলটি। দ্বিতীয়ার্ধের সাত মিনিটে অশোক চ্যাটার্জির কাছ থেকে বল পেয়ে পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে থেকে আমার বাঁক খাওয়ানো এক দুর্দান্ত শটে পরাজিত হল থঙ্গরাজ। গোলের সঙ্গে সঙ্গে ইডেনে যে আনন্দ চিৎকার উঠেছিল তার মিনিট খানেক পরে দ্বিগুণ আনন্দরোল ভেসে এল মহামেডান মাঠ থেকে। ভেবেছিলুম মহামেডান স্পোর্টিংও বুঝি গোল করেছে ইস্টার্ন রেলের বিরুদ্ধে। কিন্তু তা নয়, এক মাঠের গোলেই আর এক মাঠের আনন্দ। খেলার শেষে লীগ চ্যাম্পিয়ন মহামেডান স্পোর্টিংয়ের হাজার হাজার সমর্থক ছুটে এল ইডেনে। আমাকে কাঁধে তুলে আরম্ভ হল নাচানাচি।

সেই যে কথা আছে—ঘাট তৈরি করলেন রানী রাসমণি, নাম হল চাঁদপাল ঘাট, সেই রকমের অবস্থা। লীগ চ্যাম্পিয়ন হল মহামেডান স্পোর্টিং, নাচানাচি আমাকে নিয়ে।

আঠাশটি খেলায় অপরাজিত থেকেই মহামেডান স্পোর্টিং সেই শেষবার লীগ জেতে। ভাল খেলেছিল নিশ্চয়ই। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মূলে একজনের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। নাম পাপ্পানা। সত্যিকারের সুযোগ-সন্ধানী সেন্টার ফরোয়ার্ড ছিল। কুড়িটি গোল করে সে বছর সে-ই ছিল লীগের টপ স্কোরার।

সেদিন রাতে বাড়িতে ঢোকার আগেই পেলুম পাড়া-মাত-করা মোগলাই খাবারের গন্ধ। ঘরে ঢুকেই দেখি বিরাট এক ডেকচি ভরতি বিরিয়ানি। আর এক ডেকচিতে চাপ, সঙ্গে অন্যান্য খাবার। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জনের খাবার। এত খাবার কে পাঠাল? এ কি ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের গোলের জন্য? নাকি মহামেডান স্পোর্টিংয়ের লীগ জয়ের ভেট? শেষের আন্দাজই ঠিক। দেখলুম একটি কাগজে লেখা আছে—সাপ্লায়েড বাই আমিনিয়া।

কিন্তু অত খাবার কে খাবে? যদি পাড়ার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব-সমর্থক বন্ধুদের ডাকি, উপহাস করছি ভেবে হয়তো মেরেই বসবে। বিরিয়ানির গন্ধও হয়ত তাদের ভাল লাগবে না। অগত্যা মোহনবাগানের বন্ধুদেরই ডাকলুম। অত খাবার উড়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে। (ক্রমশ)

কানাডায় দুকবোর বলে একটা সম্প্রদায় থাকে। তারা কিছুতেই পোশাক-আশাকে বোতাম লাগাবে না। কেন জানো? বোতাম তৈরি হয় জীবজন্তুর হাড়, কিংবা দাঁত থেকে (অন্তত তাই হত, এখন অবশ্য প্লাসটিক জাতীয় জিনিস থেকেই বেশি হচ্ছে) আর দুকবোরেরা জীবহিংসার বিরোধী। তাই তারা পিন কিংবা হুক ইত্যাদি দিয়েই বোতামের কাজ চালায়।

হোয়াং হো

দিদিমণি

চীনের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী হোয়াংহো চীনের উত্তর দিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। তিব্বত থেকে বেরিয়ে এই নদী ৩,০১১ মাইল বয়ে যাওয়ার পর উত্তরের পোহাই উপসাগরে পড়েছে। হোয়াংহো নদী সিংহাই, কানসু প্রভৃতি প্রদেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়ার পর মঙ্গোলিয়ার মাঝখান দিয়ে শেনসি, শানসি, হোনান এবং শান্টুং রাজ্যের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এই নদীতে স্রোত বেশি, জল কর্দমাক্ত। নদীটি প্রায়ই গতিপথ বদলায়। জলধারা নদীর দুকূল ছাপিয়ে আশপাশ প্লাবিত করে, তাই এই নদীকে বলা হয় ‘চীনের দুঃখ’। চীনে ভাষায় হোয়াং মানে হলুদ। মঙ্গোলিয়া অঞ্চলের ‘লোয়েস’ নামে এক রকম হলুদ সূক্ষ্ম মাটির কণা বহন করে আনে বলে এই নদীর নাম হোয়াংহো অর্থাৎ ‘পীত নদী’।

নদীর অববাহিকায় ১১০,০০০,০০০ জনের বেশি মানুষ বসবাস করে। তীরে আছে বড় বড় সব শহর। অববাহিকার আয়তন ৭৪৫,০০০ বর্গ-কিলোমিটার। খ্রীষ্ট - পূর্ব তৃতীয় শতকের চীনা সাহিত্যে এই নদীর কথা লেখা হয়েছে।

হোয়াংহো নদীর গতিপথকে দু ভাগে ভাগ করা যায়—উৎস-অঞ্চলের পার্বত্য ভাগ এবং সমতলভূমি। সমভূমি অঞ্চলটিকে আবার মধ্যভাগ নিম্নভাগ এই দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। পার্বত্য অঞ্চলে নদীর দু ধারে আছে ১,০০০ ফুট থেকে ১,৩০০ ফুট উঁচু পাহাড়। মালভূমি অঞ্চলের দু পাশে আছে ১৬০ থেকে ২০০ ফুট পুরু লোয়েস মৃত্তিকা। এই মাটির ওপরে হোয়াংহো নদী গভীর উপত্যকা খনন করে এই মাটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে নদী-খাতে মাটি জমে যাওয়ায় নদীর গতি-পথ বদলে যায়।

নিম্নভাগে উত্তর-চীনের সমতলভূমিতে নদী-উপত্যকা চওড়া। সমতলভূমির এক জায়গায় অবশ্য আছে শান্টং পাহাড়। নদীর ধারে কোথাও কোথাও পনেরো থেকে তিরিশ ফুট উঁচু বালিয়াড়ি দেখতে পাওয়া যায়। নদীর পুরনো খাতগুলির উর্বর মাটিতে ধান



বোনা হয়।

হোয়াংহো নদী বেরিয়েছে ১৫,০০০ ফুট উঁচু তিব্বতের পূব দিকের পাহাড় থেকে। তিব্বতের উচ্চভূমি উত্তর-চীন সমভূমির মধ্যভাগে আছে হোয়াংহোর দুটি প্রধান উপনদী— ওয়েই হো এবং ফেন্ হো।

হোয়াং নদীর নিম্নভাগে প্রবল বন্যা হয়। অনেক জায়গায় জলাভূমি দেখা যায়। মোহনা থেকে ১৬০ মাইল দূরে বদ্বীপ আরম্ভ হয়েছে। মোহনার কাছে বালিয়াড়িও আছে।

নদী প্রায়ই গতিপথ পালটায়। আগে নদী পীতসাগরে পড়ত—এখন পড়ে পোহাই উপ-সাগরে। এই নদীতে প্রবল বন্যা হয়। ১৯৩৩ সালের বন্যায় আঠারো হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৩৬ লক্ষ মানুষ।

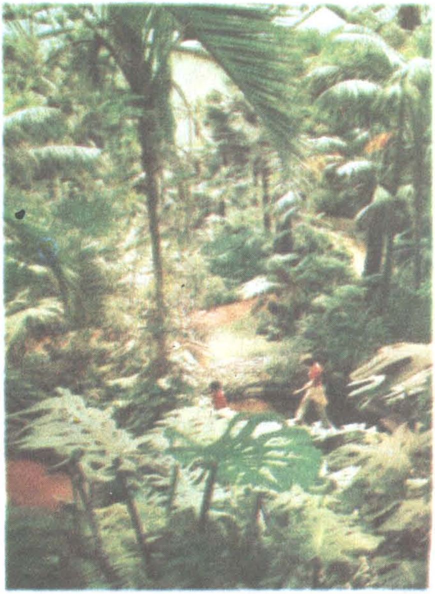
হোয়াংহো পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কাদায়-ভরা নদী। প্রতি বছরে এই নদী ১,৫২০,০০০,০০০ টন পলিমাটি সমুদ্রে বয়ে নিয়ে যায়। জলসেচ ও নৌকা চলাচলের জন্যে নদীতে যে-সব খাল কাটা হয়েছে চীনের ‘বিখ্যাত গ্র্যান্ড ক্যানাল’ তাদের একটি। আরেকটি বিখ্যাত খালের নাম পিকিং ভিকটোরি ক্যানাল। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে নদীতে বাঁধ বাঁধা হয়েছে। নানা পরিকল্পনার সাহায্যে এই নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, যাতায়াত ব্যবস্থা, জলসেচ ইত্যাদির উন্নতির চেষ্টা চলছে।

ছবির মতো শহর

প্রদ্যোত সরকার

বিদেশ এখন আর "সুদূর বিদেশ" নয়। ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা দূরকে এখন অনেক কাছে নিয়ে এসেছে। জার্মানির কথা বইয়ে পড়তুম আর ভাবতুম, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্মানি কেমন করে আবার ছবির মতো সুন্দর হয়ে উঠল!

হঠাৎ সেই স্বপ্নের দেশ জার্মানি দেখার সুযোগ এল রাতারাতি। পাসপোর্ট ও ভিসার ঝামেলা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলে এক সোনা-



ঝলমলে সকালে কলকাতা থেকে দিল্লি পৌঁছলুম। দিল্লি পৌঁছনোর বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে আমাদের প্লেন ছাড়বে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় ঐ সময়টুকু আমি বিচরণ করলুম কল্পনার রাজ্যে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছলুম, তখন ভোর ছ'টা। কুয়াশায় চারিদিক আবছা। প্লেন থেকে নেমে আমার মনে হল যেন স্বপ্নপুরী। ঝকঝকে কাঁচের দেওয়াল ঘেরা এয়ারপোর্ট; কত দোকান আর কত জিনিসের বাহার। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলুম হোটেলে। তারপর সামান্য কিছু খেয়ে



বেরিয়ে পড়লুম শহর ঘুরতে। ফ্রাঙ্কফুর্ট কোন্ শহর জানো তো? এই শহরেই বিখ্যাত জার্মান কবি গ্যেটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ফ্রাঙ্কফুর্ট ছবির মতো সাজানো শহর। শহরের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে যা আমার চোখে পড়ল বারবার তা হল জার্মানদের কর্মব্যস্ততা। কারো যেন দু'দণ্ড সময় নষ্ট করার অবকাশ নেই।

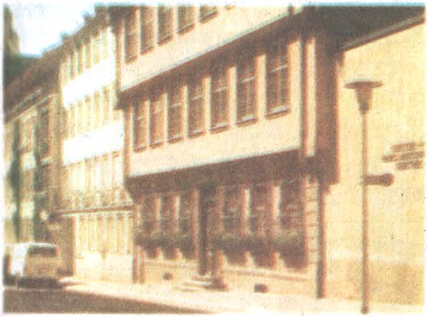
প্রতিটি বাড়িতে রঙবেরঙের ফুলের ছোঁয়া—তা জানলার সামনে ছোট ছোট টবে হোক অথবা বাড়ির সামনের ছোট বাগানে হোক। শিল্পবাণিজ্যের মূলকেন্দ্র হলেও এই শহরে প্রকৃতির প্রাচুর্য। রাস্তার দু'ধারে গাছের সারি। এই শহরেরই একপ্রান্তে বিখ্যাত ফুলের বাগান 'পামেনগার্টেন'। বারো হাজারেরও বেশি গাছগাছালি আছে এই বাগানে। আছে নানা রকমের অর্কিড ও ক্যাকটাস। খুব সুন্দরভাবে সাজানো পার্ক।

মেইন নদী শহরের ধার দিয়ে বয়ে গেছে। এই মেইন নদীর দুধারেও চমৎকার ফুলের বাগান। নদীর ধারের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য নিত্জা (nizza) ধরে হাঁটতে-হাঁটতে শহরের মধ্যেই সাজানো বন স্ট্যাডওয়াল্ড চলে যাওয়া যায়। ভাবতে পারো —যে শহরে রয়েছে ২৭০টি ব্যাঙ্ক সেই শহরের মধ্যেই সবুজ গাছের ঘন বন।



প্রকৃতিকে ওরা নিজেদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়নি। তাই চিড়িয়াখানায়ও জন্তুদের রাখা হয়েছে খুব সহজ ও খোলা-মেলা পরিবেশে। ওখানকার জন্তুদের চমৎকার স্বাস্থ্য, আর অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে চিড়িয়াখানা।

ফ্রাঙ্কফুর্ট খুব প্রাচীন শহর। তাই এখানকার গির্জাগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক। সেন্ট ক্যাথরিনের চার্চ দেখলে মনে হয় আমরা যেন সেই সপ্তদশ শতাব্দীতে ফিরে গেছি। এই চার্চেই গ্যেটের নামকরণ হয়েছিল। এখন এই চার্চের কাছাকাছি তৈরি হয়েছে অজস্র কাফে। 'দি চার্চ অব আওয়ার লেডি'ও খব সুন্দর। এই চার্চের সামনে আছে 'রকোকো' প্রথায় তৈরি ফোয়ারা।



তাছাড়া রয়েছে সেন্ট পলস চার্চ। এটি ১৭৮৭ থেকে ১৮৩৩-র মধ্যে তৈরি। সেন্ট বার্থলোমিউর ক্যাথিড্রালে হয়েছে বিখ্যাত জার্মান সম্রাটদের অভিষেক। এই ক্যাথিড্রালের চারিদিকে রয়েছে আর্ট গ্যালারি, কাফে আর পুরনো জিনিস বা অ্যান্টিকের দোকান।

"রোমার" অথবা এখানকার সিটি-হল একটা বিরাট পাথরের বাঁধানো প্রাঙ্গণের মধ্যে আছে। বিস্ময়কর কারুকার্য আছে এই পুরনো বাড়িগুলোতে। এখানে আছে জাস্টিসিয়ার বিখ্যাত মূর্তি, আর এখানেই বসে ক্রিসমাসের মেলা। এর পাশেই সেন্ট নিকোলাসের চার্চ—মধ্যযুগে এই চার্চের সামনের চত্বরে যে-সব যাত্রা বা নাটক অভিনীত হত, সেগুলি এই চার্চের উপরের গ্যালারি থেকে দেখা যেত। বিখ্যাত কবি গ্যেটের বাড়ি এক দর্শনীয় স্থান। গ্যেটের ব্যবহৃত বহু জিনিসপত্র—তাঁর লেখার টেবিল থেকে ঘড়ি পর্যন্ত—গ্যেটে হাউসে আছে।



তোমরা কি ফ্লি মার্কেটের কথা শুনেছ? এই 'ফ্লি মার্কেট' হল অনেকটা আমাদের গ্রামের হাটের মতো। নানারকম জিনিসপত্র ফ্লি মার্কেটের খোলা বাজারে পাওয়া যায়। আর যদি আমরা আলটসাখসেনহাউসেন এলাকার রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকি, তাহলে দেখতে পাব রাস্তার দু'ধারে রকমারি রেস্তোরাঁ ও পানীয়ের দোকানের সারি।

হপ্‌ত্‌ওয়াখে ফ্রাঙ্কফুর্টের সবচেয়ে ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এই রাস্তার দু ধারে অসংখ্য কাফে। বিভিন্ন জাতের লোকের ভিড় এই রাস্তায়। আসলে, গোটা ফ্রাঙ্কফুর্টেই ভ্রমণার্থীদের সুবিধার জন্য নানারকম বাহারি দোকান রয়েছে। আর সবচেয়ে মজার হল মাটির তলার দোকানগুলো, অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে তোমরা দেখলে যেন দোকানের মেলা বসেছে। কত রকমের ব্যবস্থাই না রয়েছে! তোমরা ইচ্ছে করলে তোমাদের সঙ্গের জিনিসপত্র লকারে রেখে ঘোরাঘুরি করতে পার। এখানে কেনাকাটা করতে করতে হয়তো



তোমাদের কানে ভেসে আসবে সুমধুর গানের আওয়াজ। জার্মানরা খুব সঙ্গীতপ্রিয়।

জাইল শহরের পূর্বদিকে—বড়-বড় ডিপার্টমেণ্টাল দোকান। কাউফহফ কাউফ-হালে এখানকার বিখ্যাত ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর। এইসব দোকানে জামাকাপড় থেকে শুরু করে খাবারদাবার, মসলাপাতি পর্যন্ত পাওয়া যায়। এক-একটা দোকান যেন ছোটখাটো একটা শহর। তাছাড়া, ওখানে তো জিনিস বিক্রি করার জন্য আমাদের দেশের মতো দোকানদার নেই। সবরকম জিনিসপত্র থরে থরে সাজানো আছে। নিজেদের পছন্দসই জিনিস-গুলো বাছাই করে ছোট ছোট ট্রলিতে ঠেলে নিয়ে ক্যাশকাউণ্টারে এসে দাম দিতে হয়। ওরাই ব্যাগ দিয়ে দেয়। ব্যস, জিনিসগুলো ব্যাগে পুরে নিলেই হল।

ফ্রাঙ্কফুর্টে অনেক মিউজিয়াম আছে। 'মিউজিয়াম অব হিস্ট্রি' মধ্যযুগ থেকে বর্ত-মান যুগ পর্যন্ত নানা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনের সংগ্রহশালা। 'মিউ-জিয়াম অব অ্যাপ্লায়েড আর্টস'-এ রয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর কাঠের আসবাবপত্র, চীনা-মাটি, রুপোর জিনিসপত্র। 'পোস্টাল মিউজিয়াম'-এ আছে নানাধরনের স্ট্যাম্প এবং ডাক ও তার ব্যবস্থার বিবর্তনের চিত্র। 'মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি'তে লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন সভ্যতার স্বাক্ষর যত্নসহকারে রক্ষিত আছে।

ফ্রাঙ্কফুর্টে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি 'এবেলওয় এক্সপ্রেস'-এ চড়ে। এটা কী জানো? 'এবেলওয়' আপেলের থেকে তৈরি পানীয়, এবং এটা এখানকার জনপ্রিয় পানীয়। 'এবেলওয় এক্সপ্রেস' রঙবেরঙের ছবি দিয়ে সাজানো ট্রামগাড়ি। এই গাড়িতে সব সময় বাজনা বাজছে আর তার সঙ্গে পাওয়া যায় 'অ্যাপেলওয়াইন' ও 'প্রেটজেল' অর্থাৎ এক রকমের কুড়মুড়ে নোনতা বিস্কুট। ঐ বিস্কুট খেতে খেতে সারা শহর ঘুরতে পারবে এই ট্রামগাড়িতে। কী মজার, তাই না?

তোমরা যদি কখনও সুযোগ পাও এই ট্রামগাড়িতে চেপে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহর ঘুরে বেড়িও। মেইন নদীর ধার দিয়ে হাঁটতেও ভুলো না। পায়ে হেঁটে না ঘুরলে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না।

॥ কলকাতার কোথায় কি হচ্ছে ॥

কথায় বলে মাছের বাজার।

কথাটা মুখ থেকে খসতেই যেন মাছি ভনভন করে ওঠে। তার ওপর আবার হাওড়ার মেছোবাজার। তার পাশেই আবার পানের বাজার। হাওড়া স্টেশনের উত্তর পশ্চিমে সেই বিশাল অগোছালো মাছ ও পানের বাজার এলাকাটাকেই নতুন রূপ দেবার কাজে হাত দিয়েছে সি, এম, ডি, এ, হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের মাধ্যমে।

এই কাজ শেষ হলে ঐ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য ভালভাবে চলবে। উপরন্তু পরিবেশ ভাল হবে। স্বাস্থ্যকর পরিবেশে মাছ আর পান বেচাকেনা হবে। প্রায় দশ একর জমি নিয়ে এই কাজ হচ্ছে।

মনে রেখো বাজারটা সমস্ত এশিয়ার মধ্যে অন্যতম পাইকারী মাছ ও পানের বাজার বলে নামডাক আছে।

সি, এম, ডি, এ বাজারটির আমূল সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে। তিনটে ভাগে এই কাজ চলবে। বর্তমানে তিন একর জায়গা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। সমস্ত এলাকাটায় একদিকে যেমন মাছ বিক্রীর স্টল হবে, তেমনি থাকবে কর্মচারীদের থাকবার জায়গা। আর পাশেই হবে অফিস বাড়ী। এর জন্য খরচ হবে সাড়ে তিন কোটি টাকা।

১৯৮২ সালে প্রথম স্কেপের কাজটা শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

তাহলেই দেখ, তোমরাই যে শুধু গাছ লাগিয়ে, মহল্লা সাফ করে কলকাতাটাকে সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করছ তাই নয়, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে বড়রাও রয়েছেন।

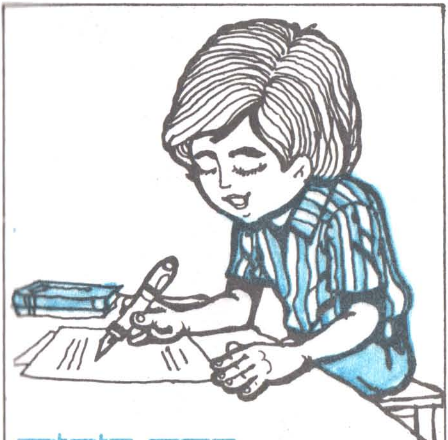
(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলিকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

চোর পালাল



একটা চোর এক বাড়িতে চুরি করতে গেল। বাড়ির একজন জেগে ছিল, সে চোরকে দেখতে পেয়ে চেঁচাতে লাগল 'চোর চোর' বলে। তখন চোরটা ছুটে রেললাইনের কাছে গেল। তখন একটা ট্রেন আসছিল, চোরটা ট্রেনে উঠে পালিয়ে গেল।

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৭)



আমার কলম

অনেকদিন আগে আমার একটি সুন্দর কলম ছিল। সেটা আমি দোকান থেকে মাত্র পঁচিশ পয়সা দিয়ে কিনেছিলাম। কিন্তু আমার ধারণা ছিল না যে অত কম দামের কলমে অত সুন্দর লেখা যেতে পারে। কলমটার রং ছিল লাল।

আমি বরাবর ওই কলমটা দিয়ে পরীক্ষা দিতাম। এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম হতাম। আমার ভাই-বোন প্রত্যেকেরই আকর্ষণ ছিল ওই কলমটার ওপর। কিন্তু আমি ওটা কাউকেই দিতে চাইতাম না। দারুণ ভালবাসতাম আমি ওই কলমটাকে।

কিন্তু সেই কলমটা একদিন আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেল। এখন পর্যন্ত আমি কলমটা খুঁজে পাইনি। তোমরা যদি কেউ আমার সুন্দর লাল কলমটা খুঁজে পাও তো আমাকে পাঠিয়ে দিও।

বাংপা বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১০)

ক্যাপ্টেন হ্যাডক



কাল দুর্গাপুর রেল স্টেশনে আমার বন্ধু সোমনাথকে বিদায় জানাতে গিয়েছিলাম। টুপিমাথায় দাড়িওলা এক সাহেব ট্রেন থেকে নামলেন।

চিনতে পেরে আমি সামনে গিয়ে বললাম, "হ্যালো, ক্যাপটেন হ্যাভক, সরি হ্যাডক। ওল্ড বয়, হাউ ডু ইউ ডু?"

আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ক্যাপটেন বললেন, "জানো না, টিনটিনকে দুর্গাপুরের গভীর জঙ্গলে গুম করা হয়েছে! তাই উদ্ধার করতে যাচ্ছি। হাঃ! হাঃ! গুড্ বাই।"

ক্যাপটেন তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

সুসান চক্রবর্তী (বয়স ১১)

ভাল লাগে

ভাল লাগে দূরে যেতে রেলগাড়ি চেপে।
ভাল লাগে ঝাউবন ওঠে যদি কেঁপে,
ভাল লাগে ভোরবেলা পাখিদের গান।
ভাল লাগে ঝরনার কুলুকুলু তান।
ভাল লাগে আকাশের ঝিকিমিকি তারা।
ভাল লাগে ফুলেভরা ছোট ছোট চারা।
ভাল লাগে ভাল ভাল গল্পের বই,
ডিমভরা কই আর চিনিপাতা দই।

ঝুমকা ভাদুড়ী (বয়স ১৪)





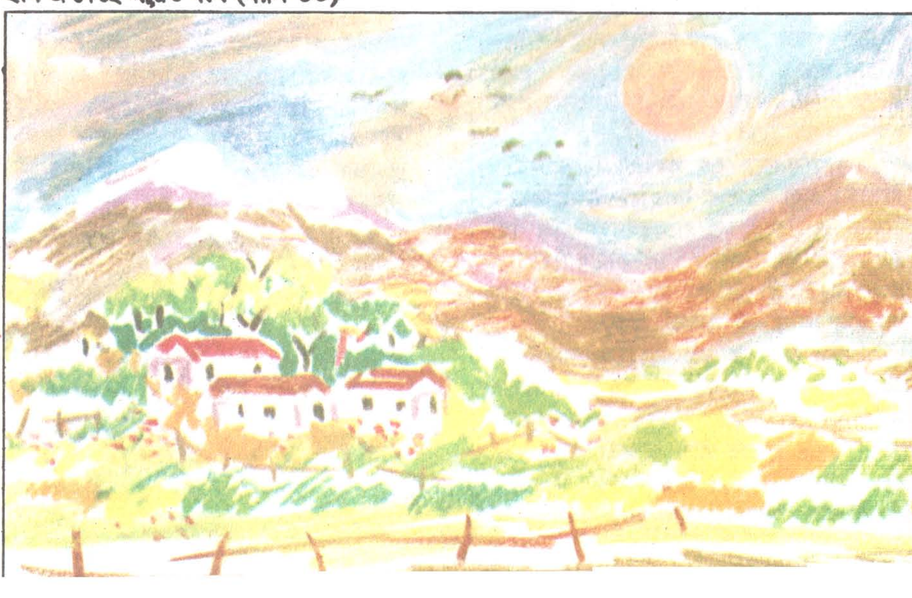
ছবি এঁকেছে সুব্রত দাস (বয়স ১০)

মেমবুড়ি

হিলতোলা চটি পরে
মেমবুড়ি যায়,
উঁচু নিচু রাস্তায়,
ডিগবাজি খায়।

সীমা বসু (বয়স ৬)





ছবি এঁকেছে রুমা ভট্টাচার্য (বয়স ৭)



বিজয় অমৃতরাজ

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

(পাতা ওলটালেই বিজয়ের খবর)

বিজিত বিজয়

অরিজিৎ সেন

বিজয় এখন বিজিতদের দলে। অবশ্য এখনও বিজয় অমৃতরাজ মানেই উচুঁদরের টেনিস। আন্তর্জাতিক কোর্টে কিন্তু ওই নাম আর দর্শক টানে না, তবে কি বিজয় শেষ হয়ে গেছেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই যুগে, যখন রমানাথন কৃষ্ণান ছিলেন ভারতের উজ্জ্বলতম তারকা। কৃষ্ণানের খেলা দেখে তখন অনুপ্রাণিত হয়েছিল দুটি খ্রীষ্টান ছেলে। তাদের নাম আনন্দ আর বিজয় অমৃতরাজ, কৃষ্ণানের মতো তারাও মাদ্রাজের বাসিন্দা। তাদের বাবা রবার্ট অমৃতরাজ প্রথম থেকেই দুই ছেলের টেনিস খেলার আগ্রহকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, যার ফলে খুব অল্প বয়স থেকেই র‍্যাকেট হাতে দুই কৃষ্ণকায় ছেলে মাদ্রাজের টেনিস মহলে বেশ পরিচিত হয়ে পড়ে।

কৃষ্ণান প্রথম থেকেই দুই ভাইকে উৎসাহিত করেন। জুনিয়র উইম্বলডনে বিজয়ের প্রথম খেলার মূলে সেই কৃষ্ণানই ছিলেন। আখতার আলিও এগিয়ে আসেন, ওদের কোচ করার জন্য।

আস্তে আস্তে বিজয়ের নাম ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। কৃষ্ণানের পরেই তার নাম, আর একজন উদীয়মান তারকা। পৃথিবীর বিভিন্ন জুনিয়র টুর্নামেণ্টে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিজয়।

কিছুদিন পরে দেখা গেল, টেনিস-বিশেষজ্ঞরা বিজয় অমৃতরাজকেই পৃথিবীর সবচেয়ে সম্ভাবনাময় জুনিয়র আখ্যা দিয়েছেন। প্রথম দশজনের তালিকায় বিজয়ের পরে সেদিন ছিল জিমি কনর্স এবং বিয়র্ন বর্গের নাম।

ধীরে ধীরে জুনিয়র থেকে সিনিয়র আসরে এলেন বিজয়। প্রথম থেকেই সবাই বিজয়ের ওপর নজর রেখেছিলেন। উইম্বলডনে পরপর দু' বছর বিজয় কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন। দাদা আনন্দের সঙ্গে ডাবল্‌সেও বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলেন।

একই সঙ্গে চলল ডেভিস কাপে ভারতের হয়ে অভিযান। এক বছর শুধু বিজয়ের জন্যই ভারত ডেভিস কাপের ফাইনালে উঠল। দুঃখের বিষয়, অপর দিক থেকে সাউথ আফ্রিকা ফাইনালের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় ভারতকে শেষ পর্যন্ত ওয়াক-ওভার দিতে হল। কারণ, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক রাখা হয় না।

ইতোমধ্যে আর একটি সাফল্য আলোড়ন আনল সারা ভারতে। বিজয় ভলভো ইণ্টার-ন্যাশনাল টুর্নামেণ্ট জিতলেন। এতে প্রাইজ মানি সমেত একটি ভলভো গাড়ি উপহার পেলেন বিজয়। কিন্তু বিদেশী গাড়ি দেশে আনায় নানারকম বাধা থাকায় লোকসভায় পর্যন্ত এই নিয়ে বিতর্ক দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে গাড়ি আনার অনুমতি পেলেন বিজয়।

সারা দেশ তখন ভারতের এই বিশ্বজয়ী তারকা বিজয়ের দিকে তাকিয়ে। ফুটবল ও হকির ব্যর্থতা ভোলার জন্য এখানকার ক্রীড়ামোদীরা বিজয়ের দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন।

কিন্তু এই আস্থা বেশিদিন থাকল না। ভলভো সাফল্যের পর বিজয় আর কোনও প্রতিযোগিতাতেই তেমন সুবিধে করতে পারলেন না। ভারতের টেনিস মহলের রাজনীতিও হতাশ করল বিজয়কে। তিনি দেশের হয়ে খেলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। কৃষ্ণানের সঙ্গে মতপার্থক্যই এর প্রধান কারণ। কৃষ্ণানকে ভারতের ডেভিস কাপ দলের নন্-প্লেইং ক্যাপ্টেন করা অমৃতরাজদের পছন্দ হয়নি। এই ঘটনার কিছু আগে থেকেই অবশ্য অমৃতরাজরাও কিছু রাজনীতি করেছিলেন। আনন্দকে ডেভিস কাপ দলে রাখার অন্য কোনও উপায় না পেয়ে বিজয় এক বছর ইচ্ছে করেই আনন্দের কাছে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হারলেন। "র‍্যাংকিং" অনুসারে সে-বছর আনন্দকে দলে নিতে বাধ্য হলেন টেনিস কর্তৃপক্ষ।

তারপর দু'ভাই পুরোপুরি পেশাদার হয়ে গেলেন। বিভিন্ন দেশে প্রাইজ মানি টুর্নামেণ্টে খেলতে খেলতে দুজনেরই আর সময় হল না দেশের ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার। এদিকে ছোট ভাই অশোক ক্রমশ বড় হচ্ছে, তাই যখন ভারতীয় গ্রাঁ প্রি শুরু হল,



মা এবং দুই ভাই আনন্দ ও অশোকের সঙ্গে বিজয় — ফোটো : প্রণব মুখোপাধ্যায়

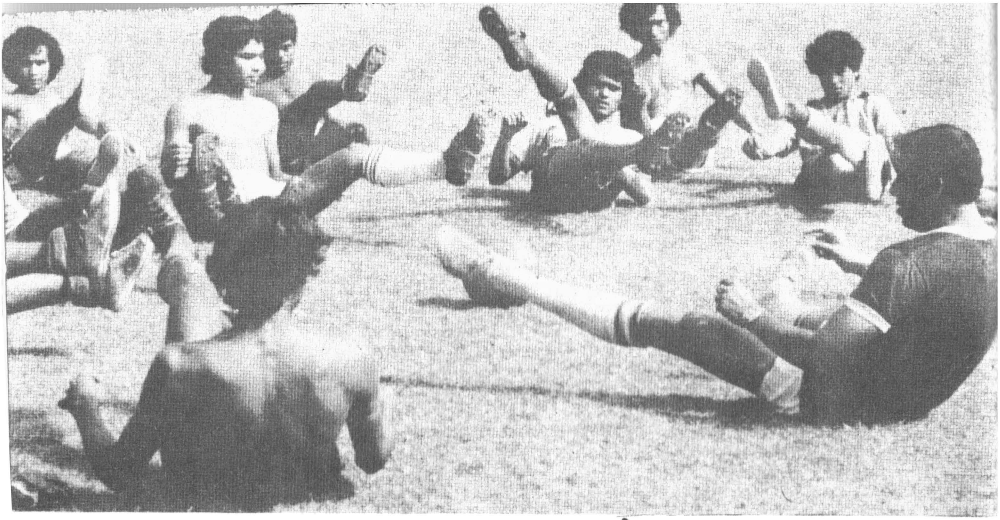
বিজয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন, অবশ্যই বেসরকারিভাবে, অশোককে টুর্নামেন্টে না নিলে তিনি খেলবেন না। বিজয়ের কাছ থেকে এ-ধরনের আবদার সহ্য করতে অভ্যস্ত ছিলেন দেশের টেনিস কর্তৃপক্ষ। কারণ, তাঁরা জানতেন ভারতীয় ক্রীড়ামোদীদের কাছে বিজয় অমৃতরাজ সবচেয়ে বড় নাম।

গত বছর উইম্বলডনে বিজয় পাঁচ সেটের যুদ্ধে হেরে যান বিয়র্ন বর্গের কাছে। শেষ পর্যন্ত বর্গই খেতাবটি পান, একটানা চতুর্থ-বার। কিন্তু সারা বছরে বিজয়ের ওই একটি খেলাই মনে রাখার মতো ছিল। টেনিস খেলায় এখন যে-ধরনের "প্রাইজ মানি" আছে তাতে প্রতিটি টুর্নামেণ্টে সেকেণ্ড অথবা থার্ড রাউণ্ডে উঠলেও একজন খেলোয়াড় বছরের শেষে ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা উপার্জন করতে পারেন। কারণ, প্রতি রাউণ্ডে খেলার প্রাপ্য টাকার সঙ্গে আছে বিজ্ঞাপন থেকে আয়।

এখন, ১৯৮০ সালে, মনে হচ্ছে বিজয়ের দিন শেষ হয়ে এসেছে। অথচ কদিন আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যাণ্ডে ডব্লু সি টির আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতায় বিজয় ফাইনালে বর্গের কাছে পরাজিত হন। এই টুর্নামেণ্টে বিজয় শেষ মুহূর্তে খেলার সুযোগ পেয়ে-ছিলেন জোস হিগুয়েরাস নাম প্রত্যাহার করার ফলে। অনেকদিন পরে বিজয়ের ফাইনালে ওঠাও রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার, কিন্তু তিনি শেষরক্ষা করতে পারেননি।

জেতার জন্য যে একাগ্রতা এবং একটু 'হিংস্র মনোভাব' দরকার, বিজয়ের খেলায় তা আর নেই। এর সঙ্গে আছে তাঁর পুরানো হাঁপানির অসুখ। একদিন যদি খেলা জেতার জন্যে তাঁকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়, পরদিন তাঁর পক্ষে ম্যাচ জেতা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। শুধু হাঁপানি নয়, বিজয়ের হাতেরও কিছু অসুবিধা আছে, যার ফলে তিনি পরপর কয়েকদিন খেলতে পারেন না। এদিকে আবার খুব বেশি বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ আজকের টেনিসে নেই। যে-ধরনের শারীরিক দক্ষতা দরকার, বিজয়ের আজ আর তা নেই।

তাই আজকের টেনিসের উৎসাহী দর্শকরা সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন রমানাথনের ছেলে রমেশের দিকে। রমেশ জুনিয়র উইম্বলডন জিতে এখন সিনিয়রদের আসরের দিকে পা বাড়িয়েছে। ক্রীড়ামোদীদের অনেকেই আশা করছেন, যা আজ পর্যন্ত কোনও ভারতীয় পাননি, সেই উইম্বলডন খেতাব হয়তো একদিন রমেশের কপালেই জুটবে।



পি-কে। খেলোয়াড়দের ব্যায়াম করাচ্ছেন

চ্যালেঞ্জ নিলাম

প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (পি. কে.)

আবার ফিরে এসেছি।

তবে সেবারের সঙ্গে এবারের কত তফাত।

হ্যাঁ, ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলের কথাই বলছি। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত যে-ইস্টবেঙ্গলের ভার পেয়েছিলাম, সেই ইস্টবেঙ্গল আর এই ১৯৮০ সালের ইস্টবেঙ্গল, তুলনা করলে মনে হয় যেন দুই মেরু। বলা বাহুল্য, দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল।

বাড়ুক। তাতে ভয় করি না। একদিক দিয়ে হয়তো ভালই হল। 'পি কে' শুধুই সুদিনের বন্ধু, অন্তত এ-কথা এখন তো কেউ বলতে পারবেন না।

"কী হবে? কেমন টীম করবেন? কী ছকে খেলবেন"—রোজই এ-সব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া এখনই সম্ভব নয়। কারণ শেষ-পর্যন্ত কাদের পাব, তা আমি নিজেই এখনও (এই লেখা প্রেসে পাঠাবার সময় পর্যন্ত) জানি না। তবে যতটা পারব, সকলের জিজ্ঞাসা তৃপ্ত করব।

অবশ্য অন্য কথা বলার আগে আমার ইস্টবেঙ্গলে ফিরে আসার পটভূমিকা সম্পর্কে দু এক কথা বলতে চাই। যে-ক্লাবেই থাকি না কেন, আমি ক্লাবের দলীয় কোঁদলকে সযত্নে এড়িয়ে যাই। যে ছেলেদের পাই—অন্তত মোটামুটি ভাল দল আশা করতেই পারি—তাদের নিয়েই কাজ চালাতে চাই। আর কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া বা সমঝোতার মধ্যে খেলোয়াড়দের এনে দাঁড় করাতে চাই।

যেখানেই থাকি না কেন, ক্লাবের কাছে আমার কতকগুলি প্রত্যাশা থাকে। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ আমার সমস্ত প্রত্যাশাই পূরণ করবেন বলে জানিয়েছেন। কী সেই প্রত্যাশা? প্রথমত, আমার প্রশিক্ষণ-পদ্ধতিতে কারও কোনও-রকম হস্তক্ষেপ চলবে না। আমাকে খেলোয়াড়দের তালিম দিতে হচ্ছে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিধিনিয়মের মধ্যে—যেমন দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, খেলোয়াড়দের মানসিকতা ইত্যাদি। কাজেই আমাকে প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে নমনীয়তা আনতে হয়। প্রয়োজনমত রদবদল করতে হয়।

সেইরকম, দল-নির্বাচন বা দল-গঠন সম্পর্কেও শেষ কথাটি আমিই বলব। তৃতীয়ত, খেলোয়াড়রা ক্লাবের কাছে কী প্রত্যাশা করছেন বা কী পাচ্ছেন সে-সবের মধ্যে না যেতে চাইলেও, তাঁরা যা-ই পাবেন সেটা সম্পর্কে যা কথা হবে, ক্লাব কর্তৃপক্ষ সেটা সঠিকভাবে মেনে চলবেন। আশাহত খেলোয়াড় কখনই ভাল খেলতে পারেন না। আবার, খেলোয়াড়রা কী দিচ্ছেন

ক্লাবের দিক থেকেও তার একটা হিসেব থাকা চাই। ট্রেনিংয়ে কমপক্ষে একটা নির্দিষ্ট শতকরা ভাগ পর্যন্ত উপস্থিত থাকতেই হবে। অবশ্য কোনও খেলোয়াড় অসুস্থ হয়ে পড়লে আলাদা কথা। সেখানেও দেখি অসুস্থতাটা সত্যি সত্যিই, না অজুহাত মাত্র। সত্যি হলে ডাক্তার দেখাতে হবে। অসুস্থতা, আঘাত, যা-ই হোক না কেন আমার খেলোয়াড়দের জন্যে সেরা-সেরা ডাক্তার চাই। আর চাই পুষ্টিকর খাদ্য।

আসলে আমি যে-সব জিনিস চাই তার উদ্দেশ্য একটাই—খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্বন্ধ বজায় রাখা। দুয়েরই কর্তব্য থাকে দুয়ের প্রতি।

এতক্ষণ স্বার্থপরের মতো নিজের প্রত্যাশার কথাই বললাম। ইস্টবেঙ্গলের সভ্য-সমর্থকরাও তো আমার কাছে কিছু আশা করেন। করবেনই। অর্থাৎ সেই প্রশ্নটিই আবার আসছে—কী হবে?

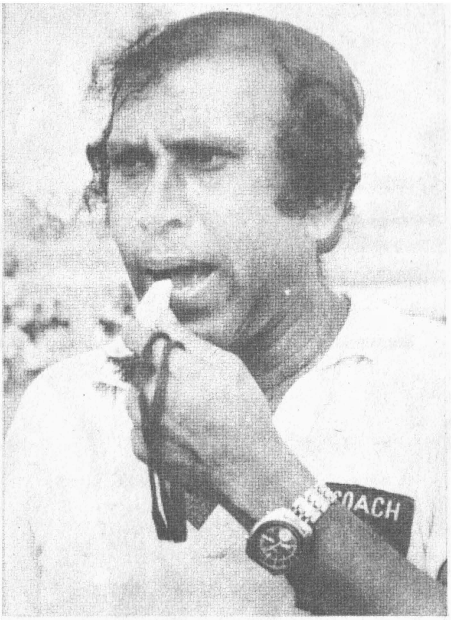
গোড়াতেই সবিনয়ে স্বীকার করেছি, এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। গত বছর কাগজে-কলমে মোহনবাগানের চাইতে ইস্টবেঙ্গলের দল অনেক ভাল ছিল। এবার ব্যাপারটা ঠিক উল্টো।

যা হবার তা হবেই। আমার অবস্থাটা উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল অশান্ত সমুদ্রের বুকে টলমল এক জাহাজের ক্যাপ্টেনের মতো। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তবে এখনও তো মরিনি। যদি জাহাজডুবি হয়, সকলে এক-সঙ্গেই ডুবব। আর যদি ভাসি, সকলে একসঙ্গেই ভেসে বেঁচে থাকব।

তবে ইস্টবেঙ্গল-জনতাকে আমি হয়তো এখনই কিছু দিতে পারব না। দেশের বেলায় যেমন যুদ্ধ, বন্যা, খরা, মহামারীর পর পুনর্গঠনে সময় লাগে, ক্লাবের জীবনেও সেইরকম সময় আসে। একটু ধৈর্য ধরতে হবে।

জানি, সেটার জন্যে সকলে তৈরি নন। কিন্তু উপায় কী? যদি সব ঠিকমতো চলে, তবে ভাল ফল করবই। দল যত দুর্বলই হোক, তাকে চাঙ্গা করে তোলার অঙ্গীকার নিয়েই তো এসেছি। আবার বলছি, আমি সেই চ্যালেঞ্জ নিলাম।

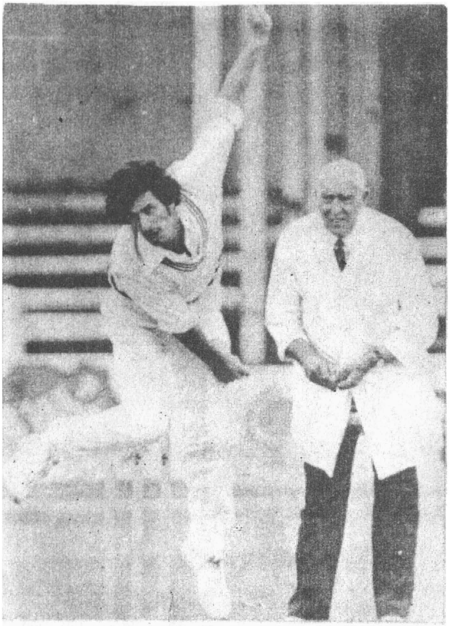
ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য



"আর দেরি নয়, নেমে পড়ো সবাই।"

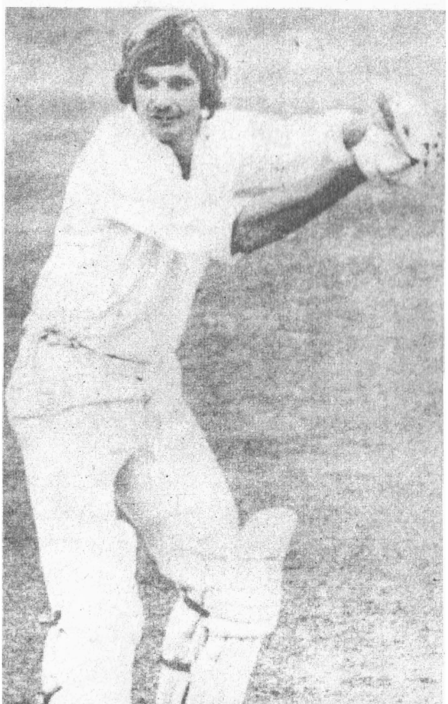
"এইভাবে আটকে দেবে বলটাকে।"





নিউজিল্যাণ্ডের বোলার হ্যাডলি

নিউজিল্যাণ্ডের হাওয়ার্থ



ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পরাস্ত

শ্যামসুন্দর ঘোষ

ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের মতো শক্তিশালী দলকে শেষ পর্যন্ত হারতে হল নিউজিল্যাণ্ডের কাছে। স্বদেশের মাটিতে তিন-টেস্ট-সিরিজের খেলায় নিউজিল্যাণ্ড প্রথম টেস্টে জয়লাভ করে এক উইকেটে। পরবর্তী দুটি টেস্ট শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে। টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে নিউজিল্যাণ্ডের এটাই প্রথম রাবার লাভ।

দুই দেশের টেস্ট লড়াইয়ে যদিও জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছে এক উইকেটের ব্যবধানে, তবুও তিনটি টেস্টেই নিউজিল্যাণ্ড দল ব্যাটে-বলে-ফিল্ডিংয়ে প্রতিপক্ষের তুলনায় উন্নত ক্রীড়ামানের পরিচয় দিয়েছে। প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করেছিল ১৪০ ও ২১২। প্রত্যুত্তরে নিউজিল্যাণ্ডের রান হয়েছিল ২৪৯ ও ৯ উইকেটে ১০৪। দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সংগ্রহ করেছিল ২২৮ ও ৫ উইকেটে ৪৪৭। নিউজিল্যাণ্ড সেক্ষেত্রে এক ইনিংসে ব্যাট করে রান করেছিল ৪৬০। তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান যথাক্রমে ২২০ ও ২৬৪। নিউজিল্যাণ্ড দুই ইনিংসে করেছিল ৩০৫ ও চার উইকেটে ৭৩।

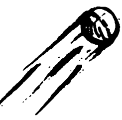
তিনটি টেস্টেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও টসে জয়ের বাড়তি সুযোগটিকে তারা কাজে লাগাতে পারেনি। এই টেস্ট-সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানেরাই যে শুধু ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, দলের দ্রুতগতি-সম্পন্ন বোলাররাও বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেননি। মাস কয়েক আগে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যে বোলারদের মনে হয়েছিল ভয়ঙ্কর, নিউজিল্যাণ্ডের মাটিতে তাঁদের মনে হয়েছে নেহাতই সাদামাটা বোলার। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই দলটি মাত্র মাস দুয়েক আগে অস্ট্রেলিয়াকে তিনটি টেস্টের মধ্যে দুটিতে পরাজিত করেছিল। আবার ঐ অস্ট্রেলিয়াদলের কাছে ইংল্যাণ্ড পরাজিত হয়েছিল তিনটি টেস্টে।

নিউজিল্যাণ্ডের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই ব্যর্থতা কেন? ক্রিকেট-বিশেষজ্ঞদের মতে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটে বল মাটিতে পড়ে দ্রুত-গতিতে ছোটে। তাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলাররা কৃতকার্য হয়েছিলেন। কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডের উইকেট ফাস্ট বোলারের সহায়ক না হওয়ায় তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। আর সেই ব্যর্থতা ঢাকা দেওয়ার জন্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়েরা নিউজিল্যাণ্ডের আম্পায়ারদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভি-যোগ তুলেছেন। টেস্ট ক্রিকেটে পরাজিত দল আম্পায়ারদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলে, সেটা সাম্প্রতিককালে কিছু নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু আম্পায়ারদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়েরা যে আচরণ করলেন, তা শুধু দৃষ্টিকটু নয়, ক্রিকেটের আদর্শের পরিপন্থীও। দ্বিতীয় টেস্টে নিউজিল্যাণ্ডের অধিনায়ক জিওফ হাওয়ার্থ করেছিলেন অপরাজিত ১৪৭ রান। টেস্ট ক্রিকেটে হাওয়ার্থের এটিই সর্বোচ্চ রান। এর আগে ১৯৭৮ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে করেছিলেন ১২৩। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের অভিযোগ, হাওয়ার্থ ৬৮ রানের মাথায় উইকেট-রক্ষকের হাতে কট আউট হয়েছেন। কিন্তু আম্পায়ার ফ্রেড গুডেল আউটের আবেদন নাকচ করে দেন। অসন্তোষ বিক্ষোভ দানা বাঁধে, যখন গুডেল কলিন ক্রফটের একটি বলে 'নো বল' ডাকেন। ক্রফট শুধু আম্পায়ারের প্রতি অশালীন মন্তব্য করেই ক্ষান্ত হননি, বল করতে আসার পথে ইচ্ছে করে গুডেলকে ধাক্কাও মারেন। এই টেস্ট-সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলাররা নিজেদের অসন্তোষ জানাতে একাধিকবার পা দিয়ে উইকেট ভেঙে দিয়েছেন। তবে সবকিছু অভব্যতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের চা-পানের পর খেলতে নামতে অনিচ্ছা প্রকাশ। শেষ পর্যন্ত ১৩ মিনিট বাদে খেলা শুরু হয়।

সাম্প্রতিককালে ক্রিকেট-খেলোয়াড়েরা মাঠে যে ধরনের আচরণ করছেন, তাতে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আম্পায়াররা অন্যান্য খেলার মতো ক্রিকেটেও খেলোয়াড়দের মাঠের বাইরে বের করে দেওয়ার অধিকার দাবি করতে পারেন। ক্রিকেটে মাঠে হাজার অশালীন ব্যবহার করলেও আম্পায়ারদের খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে সাময়িক কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা নেই। অন্যান্য খেলা থেকে ক্রিকেটকে এতদিন পৃথক চোখে দেখা হয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, অন্যান্য খেলার মতো ক্রিকেটেও হয়তো অদূর ভবিষ্যতে হলুদ বা লাল কার্ডের প্রবর্তন ঘটবে।

খেলাভঙ্গ

রণজিৎ মিত্র



পথ চলতি লোকেরা সব
পায় না খুঁজে পথ
হঠাৎ ভুলে ক্রীজে এলে
দেবে যে নাকখত!
সুনীল কপিল বিন্নি দিলীপ
ঘাউড়ি বিশ্বনাথ
যশপালেরই যশের মতো
কেউ-বা পাকায় হাত।
বাজার নিয়ে ব্যাজারবদন
পঞ্চুদাদু আসে—
খেলার ভয়ে জড়োসড়ো
চলেন পথের পাশে।
কিন্তু হঠাৎ আচমকা এক
বাম্পার কে হাঁকে—
হুক শটটা লাগল এসে
পঞ্চুদাদুর টাকে।
মুখ থুবড়ে গেলেন পড়ে
টাক ফুলে জয়ঢাক
ব্যাগ থেকে সব শাক-সবজি
গড়ায় ঝাঁকে ঝাঁক।
বন্ধ খেলা, ছেলেরা সব
গোটাল পাততাড়ি।
ব্যাটসম্যানটা বেকুব মেরে
ওভার বাউন্ডারি।

কবিতার কাজ

কুন্তক

আধুনিক কবি নিয়ে কথা হচ্ছে, তাই বৌদিও এলেন এগিয়ে। বললেন ঃ সেই-যে তোমার ছোটবেলার বন্ধুর গল্প বলেছিলে, এও তো তাই।

কোন্ গল্প?

ওই-যে, দুধের মতো লাল। তা, তাকে নিয়ে কেন হেসেছিলে সেদিন? সবুজ আলোর ভোরটাও কি তেমনি হাসির নয়? সত্যি বাপু! ভাষাটা কি খেলার জিনিস? আধুনিক কবিদের কাণ্ডটাই এই রকম।

যদি বলো, কবিদের কাণ্ডটাই এ-রকম, তাহলে সেটা মানতে পারি। হঠাৎ আধুনিক কবিদের নিয়ে টানাটানি কেন?

নন্তু বলল ঃ কেন নয়? আগের কবিরা কি এত পাগল ছিলেন?

ছিলেন না বলছিস? আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ যদি লেখেন 'লুটিয়ে পড়ে সে গান মম/ ঝড়ের রাতের পাখি সম', তাহলে?

তাহলে কী? 'কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলো'র সঙ্গে এর মিলটা কোথায়?

সেটা পরে ভাবব। আগে বল, কথাটা কেমন। কেমন রে টুম্পি?

আমার তো ভালই লাগছে ভাবতে।

লাগছে তো? কিন্তু মজাটা দেখ। সুর তো আর দেখার জিনিস নয়, সুর তো আমরা শুনি। আর ঝড়ের রাতের পাখি যে লুটিয়ে পড়েছে, সে তো দেখার ব্যাপার?



আরে, তাই তো। আগে তো ভাবিনি সেটা।

দেখার ছবি দিয়ে শোনার কথাটা বোঝাতে হল। এ লাইনটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে গানের যেন একটা শরীর এসে গেল। সুর যে লুটিয়ে পড়ছে, যেন দেখাই গেল সেটা।

বৌদি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ দিয়ে কী বোঝাতে চাইছ বলো তো? আসল কথাটা কী?

আসল কথাটা হচ্ছে—চোখের সঙ্গে কান, কানের সঙ্গে ঘ্রাণ, ঘ্রাণের সঙ্গে ছোঁয়া, এসব অনেক সময়েই মিলিয়ে দেন কবিরা, এর সঙ্গে ওকে। ধরো রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'তার গলায় সুর ওঠে ঝলক দিয়ে/নটীর কঙ্কণে আলোর মতো।' কাঁকনে আলোর ঝলক আর গলায় সুরের ঝলক তো এক নয়, দু রকম ব্যাপার তো? এখানেও দেখার ছবি দিয়ে বোঝানো হল শোনার কথা।

সোনার কথাও বটে। কাঁকনটা তো সোনারই? নন্তুর কথায় কান না দিয়ে বলি ঃ কিংবা ধরো, 'হাসির কোলাহল উঠল/গাছে গাছে ডালপালায়।' এবার? শোনা দিয়ে দেখার ছবি, হাসি দিয়ে ফুলপাতার।

দেখাশোনা বাদ দিয়ে বলো দেখি কাকু। দেখি কেমন পারো।

পারব না কেন? রবীন্দ্রনাথ থেকেই বলি। 'কিসের একটা অস্পষ্ট গন্ধ/মূর্ছিতের নিশ্বাসের মতো।' অস্পষ্ট নিশ্বাসের মতো অস্পষ্ট গন্ধ। ছোঁয়া দিয়ে বোঝানো হল না গন্ধটাকে?

কিন্তু এসবের সঙ্গে জীবনানন্দের ওই লাইনের সম্পর্কটা কী?

বলি সেটা। 'কচি লেবুপাতা' কথাটা বললে তার ছবিটাও যেমন মনে আসে, ছোঁয়াটা যেন লাগে গায়ে, হয়তো-বা তার গন্ধটাও। তবে তার সবটাই খুব নরম। হালকা সবুজ, নরম ছোঁয়া। সবুজের এই নরম ছোঁয়াটা যেন নিয়ে আসছে ভোর, এ কথাটা বললে দোষ কী?

গুণই বা কী?

গুণ হল এই যে, গোটা ভোরবেলাটা রূপে গন্ধে স্পর্শে জড়িয়ে ধরে পাঠককে, ওই কথাটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে। সেইটেই না কবিতার কাজ?

(ক্রমশ)

মিলির খারাপ দিন

প্রসাদ

ভোরে উঠেই মিলি বুঝতে পেরেছিল আজ দিনটা খারাপ যাবে। মা যেই ডেকেছেন, "মিলি, ওঠো, নইলে বাস ধরতে পারবে না", অমনি সে তাড়াতাড়ি উঠতে গেছে, দেখতে পায়নি কাঁচের প্লেটটা খাটের পাশেই ছিল। তাতে ছিল দুধ। আরাবল্লী যদি ফিরে আসে রাত্তির বেলায়, তার জন্যে ব্যবস্থা। পড়বি তো পড় মিলির পা সেই দুধের প্লেটে। ফলে প্লেট ভাঙল আর মিলি খেল এক আছাড়।

"It's going to be a bad day," Milly said to herself.

তারপর ইস্কুলের বাসে তাড়াতাড়ি করে উঠতে গিয়ে আরেকটা আছাড় আরেকটু হলে খাচ্ছিল, বাসের কনডাকটর মিশ্রজী চট করে ধরে ফেললেন। তাই বেঁচে গেল।

"It *is* going to be a bad day," Milly repeated to herself.

ইস্কুলে গিয়ে তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু বর্ণালীর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল, কপিলদেব ভাল না গাভাসকার ভাল তাই নিয়ে।

"I knew something like this was going to happen," Milly thought.

শুধু তাই নয়, কথা বলার জন্য মিস দোসানি আবার মিলিকেই বকলেন, যদিও বর্ণালীরই দোষ। অবশ্য এখন মনে হচ্ছে বর্ণালীরও দোষ নেই, আজ দিনটাই খারাপ, নইলে প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে কারো ঝগড়া হয়? তা আবার মিস দোসানির ক্লাসে? উনিই তো একদিন মিলির আনন্দমেলা কেড়ে নিয়েছিলেন। নতুন আনন্দমেলাটা সেদিন সকালেই দিয়ে গেল, মিলি ভাবল, টিফিনের সময়ে একটু পড়ব। মিস দোসানির ক্লাসে বাক্স থেকে বের করে রাজর্ষিকে খালি একটু দেখাতে যাচ্ছিল, ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখে পড়ে গেল?

"What have you got there, Chameli? May I see it, please?"

"It's a magazine, Miss. I wasn't reading it. I was only—"

"Bring it over, will you?"

পুরো এক সপ্তাহ মিস দোসানি আনন্দমেলাটা আটকে রাখলেন, তারপর ফেরত



দিলেন। দাদা ঠাট্টা করে তখন বলেছিল, "তোদের দিদিমণি তো বাংলা ভাল জানেন না, তাই অত দিন লাগল পড়তে।" মিস দোসানিকে তো দাদা চেনে না, কীরকম কড়া। একবার যদি দাদাকে ক্লাসে পেতেন, ঠাট্টা করা বের করে দিতেন।

যাই হোক, আজকের দিনটা যে খুব খারাপ সে তো দেখাই যাচ্ছে। বাড়িতে মায়ের বকুনি, ইস্কুলে বকুনি, তার ওপর বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া। আরো কী কী হবে কে জানে। কে জানে আরো কত দুর্ঘটনার কথা আজ রাত্তিরে ডায়েরিতে লিখতে হবে।

* * *

* * *

রাত সাড়ে আটটা। মিলি ডায়েরি লিখছে:

As soon as I got up this morning, I knew it was going to be a bad day. I put my foot in a saucer with milk in it. The milk was for Araballi in case she came back during the night. I stumbled and fell down and broke the saucer. Then I was sure it *was* going to be a bad day.

Next, at school I had a quarrel with Barnali, my best friend. I was not surprised because I knew something like that was going to happen.

Then Miss Dosani scolded me for talking in class. Again, I wasn't surprised. I didn't tell her that Barnali was talking more than I was.

* * *

* * *

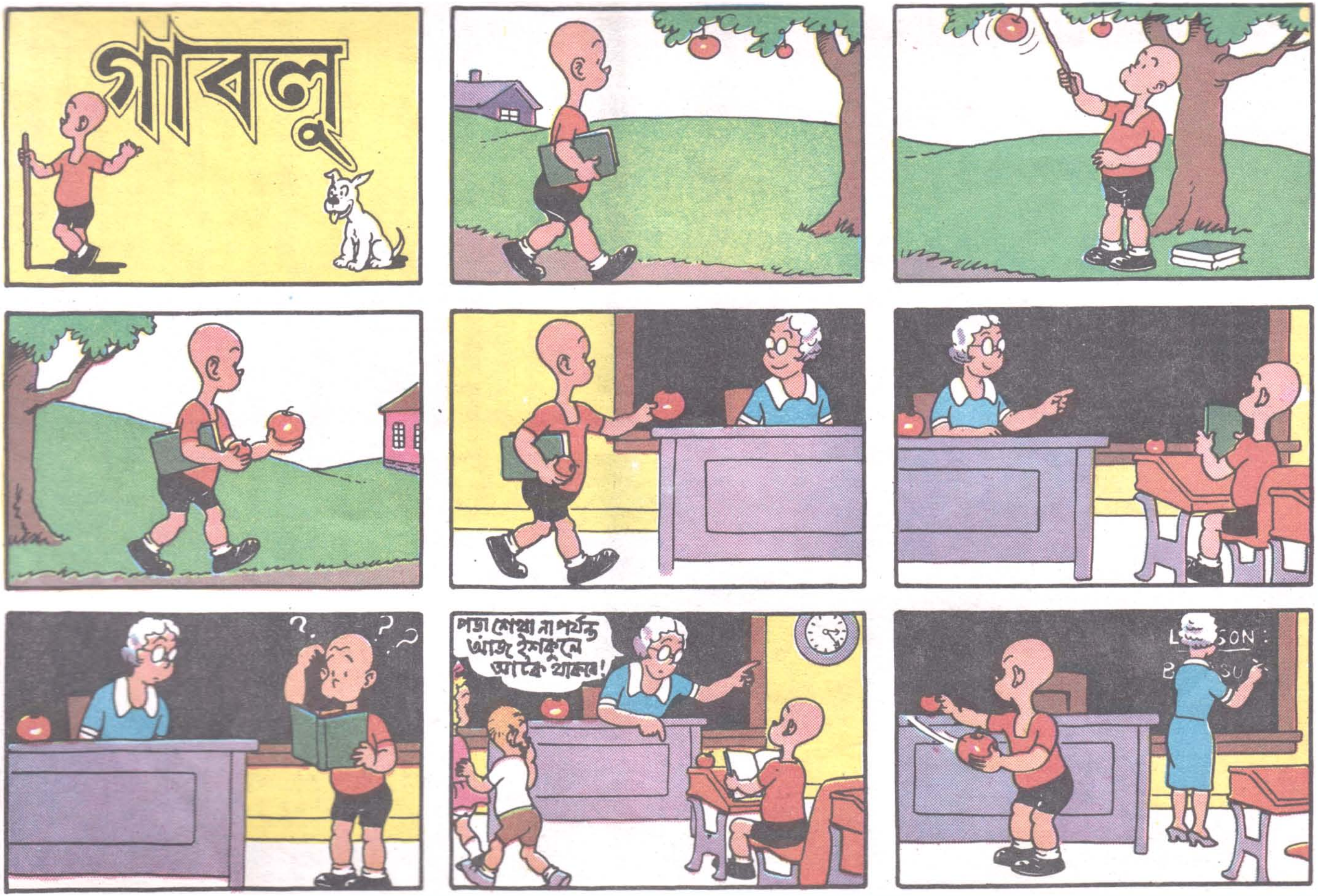
এবারে লক্ষ করো:

"It's going to be a bad day," said Milly to herself.

Milly said to herself that it was going to be a bad day.

এ নিয়ে পরেরবার আরো কথা হবে।


টারজান
এডগার রাইস বারোজ
ভূগর্ভ থেকে ০-২২০ বিমানে ফিরে আসছেন টারজান। পৃথিবীর উপরে তখন নতুন করে নির্মিত হচ্ছে ভূমিকম্পে-বিধ্বস্ত সব শহর....
ভূগর্ভের মাহারদের মেরে টারজানই এ-যাত্রায় মানবসভ্যতাকে বাঁচিয়েছেন!
জেন এদিকে প্রতীক্ষা করছেন টারজানের জন্য।
মাঝে-মাঝে তাঁর ভয় হয়, টারজান সত্যি ফিরবেন তো?
প্রহরীদের নিয়ে বনের মধ্যে তিনি ঘুরে বেড়ান।
এই বনেই টারজানের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল....
আজও এইখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হল জেনের।


গাবলু
পড়া শেখা না পর্যন্ত আজ ইশকুলে আটকে থাকবে!

কারমেল হাইস্কুলের প্রধান-শিক্ষিকা কী বলেন

সাধনা মুখোপাধ্যায়

ঢাকুরিয়া ব্রিজ যেখানে ঢালু হয়ে নেমে গেছে তারই শেষ প্রান্ত থেকে কিছু দূরে গিয়ে রাস্তার ওপরের বাঁ-দিকের সাদা বড় বাড়িটাই কারমেল হাইস্কুল। বরাবরই কিন্তু কারমেল হাইস্কুলের এত বড় বাড়ি ছিল না। শুরু হয়েছিল ১৯৫৬ সালের ১ এপ্রিলে ১১ দেশপ্রিয় পার্কে প্রাইমারি স্কুল হিসেবে। তখন নাম ছিল সেণ্ট মেরিজ কারমেল স্কুল।



১৯৬৬ সালে উঁচু ক্লাসগুলি গড়িয়াহাট রোডের এই বাড়িতে চলে আসে। ১৯৬৯ সালে এটি হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল হিসেবে বোর্ডের স্বীকৃতি পায়।

অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এই স্কুলের ছাত্রীরা বোর্ডের পরীক্ষায় তিনবার স্ট্যাণ্ড করেছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১৯৭২ সালে অষ্টম, ১৯৭৪ সালে বিজ্ঞানে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল এই স্কুলেরই দুজন ছাত্রী। ১৯৭৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান পায় শ্রীলা দত্ত। প্রতি বছরই চার-পাঁচজন ছাত্রী ন্যাশনাল স্কলারশিপ পায়।

এই স্কুলের কোনো ছাত্রীই সাধারণত মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল করে না। বেশির ভাগ ছাত্রী পাস করে প্রথম বিভাগে। গত বছর অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে, ৫৬ জন ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। তার মধ্যে ৪৮ জন প্রথম বিভাগে, এবং আট জন দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে।

এই স্কুলের প্রধান-শিক্ষিকা সিস্টার জোসেফিনার বিষয় ইংরেজি। প্রধান-শিক্ষিকা হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা কুড়ি বছরের।

"পরীক্ষায় কীভাবে প্রশ্নের উত্তর লিখলে বেশি নম্বর পাওয়া যায়?" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "উত্তর সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ হওয়া চাই। পরিচ্ছন্নতার দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। পাঠ্য বই ভাল করে বুঝে এবং সতর্কতার সঙ্গে পড়তে হবে। পাঠ্যাংশ থেকে যত্ন করে সঠিক উত্তর বেছে নিতে হবে। না বুঝে মুখস্থ করলে চলবে না। পরীক্ষা সংক্ষিপ্ত ও নির্ভুল উত্তর দাবি করে। বই থেকে সেটা আহরণ করে নিতে হবে। বুদ্ধি খাটিয়ে পড়তে হবে।

"প্রতিটি বিষয়ই ভাল করে পড়তে হবে রোজ। প্রত্যেকদিনের পড়া প্রত্যেকদিন তৈরি করতে হবে। 'পরীক্ষার সময় পড়ব' বলে রেখে দিলে চলবে না। সাধারণ ছাত্রীর স্কুলের পাঠ্য বই ভাল করে পড়লেই চলবে, কিন্তু ভাল ছাত্রীদের বেশি নম্বর পাওয়ার জন্যে বাইরের বই পড়তে হবে বেশি করে। সেগুলির সাহায্যে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তৈরি করলে ফল ভাল হয়।"

"ইংরেজি কীভাবে পড়লে পরীক্ষার ফল ভাল হবে?"

এই প্রশ্নের উত্তরে সিস্টার জোসেফিনা বললেন, "ইংরেজিতে বাক্যের গঠন ও গ্রামার ঠিক হওয়া চাই। পরীক্ষক যত বড় উত্তর চেয়েছেন উত্তর যেন ঠিক তত বড়ই হয়। বানান ভুল করা একেবারেই চলবে না, যতি-চিহ্ন ঠিকমতো বসাতে হবে।"

বাংলা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সিস্টার জোসেফিনা বললেন, "বাংলার জন্যে প্রচুর বাইরের বই পড়তে হবে। বড় বড় কবি ও লেখকের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে

হবে। ব্যাকরণ, যতিচিহ্ন, বাক্যগঠন সবই ঠিক রাখতে হবে।"

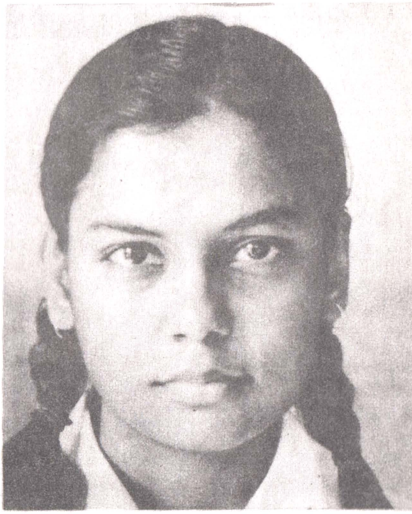
অঙ্ক সম্পর্কে সিস্টার জোসেফিনার অভিমত ঃ "ঠিকমতো মনঃসংযোগ করতে হবে, এর জন্যে চাই প্রতিদিন অভ্যাস। ক্লাসে যে-সব অঙ্ক কষানো হচ্ছে সেগুলো ভাল করে বুঝে নিয়ে বাড়িতে পুরো অধ্যায়টা ভালভাবে কষে নিতে হবে।"

বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি বললেন, "ছোট ও নির্ভুল উত্তর হওয়া চাই। লাইফ সায়ান্স ছবি এঁকে বোঝাতে হবে। ফিজিক্যাল সায়ান্সে প্রবলেম এবং ইকুয়েশান ভাল করে শিখতে হবে।"

অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সিস্টার জোসেফিনা বললেন, "ভূগোলে ভাল নম্বর পাওয়ার জন্যে যেখানে প্রয়োজন সেখানে ম্যাপ আঁকতে হবে। ইতিহাসে বাইরের বই প্রচুর পড়তে হবে, শুধু পড়ার বইয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকলে চলবে না। শারীর-শিক্ষার জন্যে প্রত্যহ অভ্যাস করতে হবে। কর্মশিক্ষায় স্কুল যে প্রকল্পটি বেছে নিয়েছে সেটির কাজ ঠিকমতো করতে হবে। ওয়ার্কবুক ঠিকমতো তৈরি করতে হবে। ভালভাবে হাতে-কলমে কাজ করতে হবে।"

পরীক্ষা - প্রসঙ্গে সিস্টার জোসেফিনা আরেকটা কথা বললেন, "মাধ্যমিক পরীক্ষায় অনেক বিকল্প প্রশ্ন থাকে। প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর বিকল্প প্রশ্নগুলির ভেতর থেকে বেছে নিয়ে ভালভাবে জানা প্রশ্নের উত্তর লিখলে ভাল ফল পাওয়া যায়।"

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল



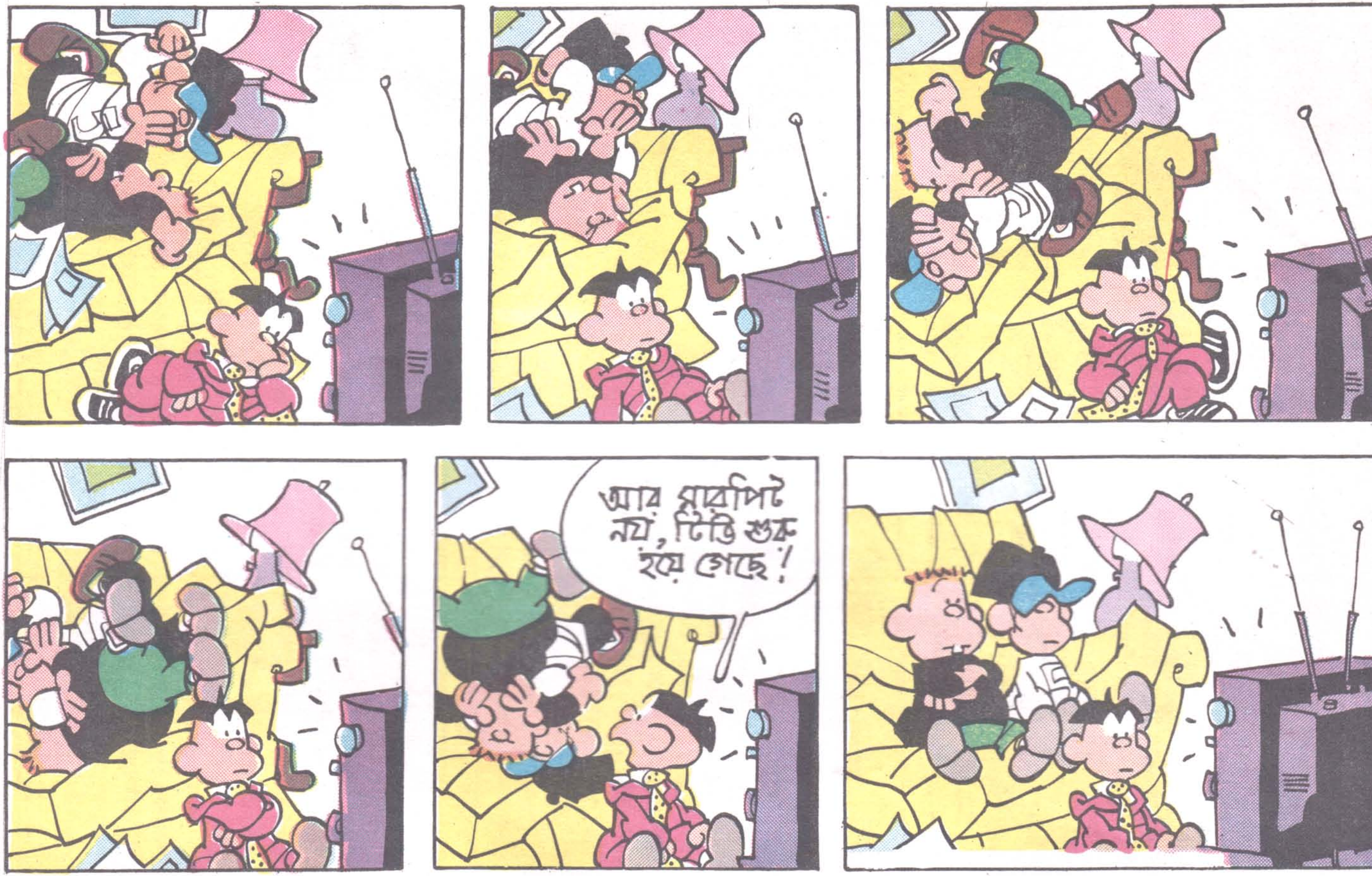
ফোটো : সত্যেন সেন

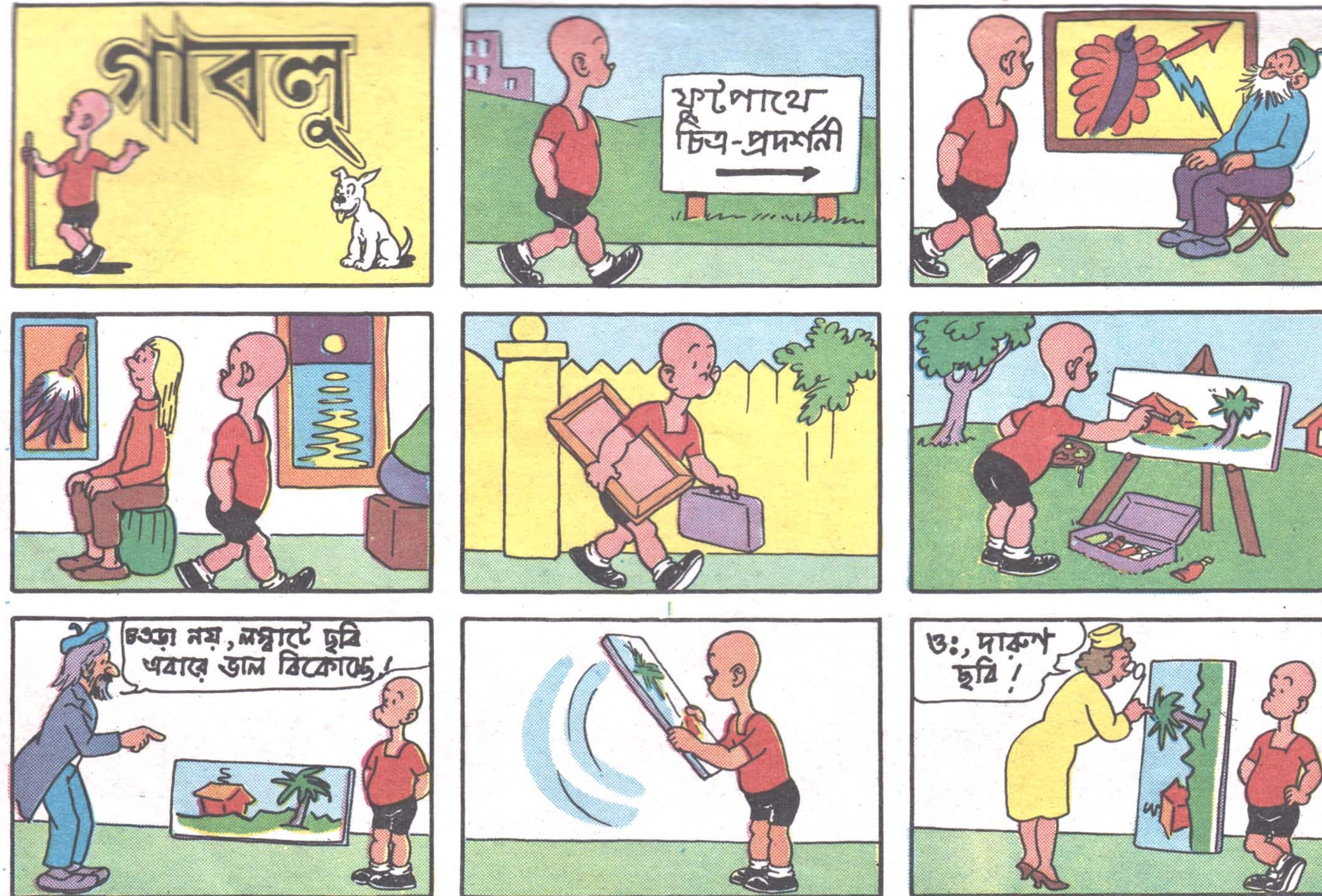
নাইন থেকে দুটো সেকশান মিলিয়ে ক্লাসে প্রথম হয়ে ক্লাস টেনে উঠেছে সঞ্চিতা দাস। থাকে পদ্মপুকুরের কাছেই ডাঃ রাজেন্দ্র রোডে। বয়স পনেরো বছর। বাবা রেলে কাজ করেন। সঞ্চিতা কে জি থেকে এই স্কুলে পড়ছে। ক্লাস ফাইভ থেকেই প্রতি বছর ক্লাসে ফার্স্ট হচ্ছে সঞ্চিতা। স্কুলের দিন সকালে ওর পড়া হয় না। সন্ধেবেলা চার ঘণ্টা পড়ে। ছুটির দিন সকালে পড়ে তিন ঘণ্টা, দুপুরে অঙ্ক কষে। সব বিষয়েই টেস্ট পেপার্স থেকে ও স্কুলের দেওয়া প্রশ্ন থেকে উত্তর তৈরি করে সঞ্চিতা। মা বাংলা পড়ান। বাবা অঙ্ক দেখে দেন। দাদা ফিজিক্যাল সায়ান্স পড়ান। সঞ্চিতার কোনো গৃহশিক্ষক নেই। সঞ্চিতার সবচেয়ে ভাল লাগে ইংরেজি। বড় হয়ে সঞ্চিতার ইচ্ছে ইংরেজি নিয়ে পড়ার। স্কুলের পড়া ছাড়া গল্পের বই পড়তে ভালবাসে সঞ্চিতা।

কোন্ বিষয়ে সে কী বই পড়ে জিজ্ঞেস করতে সঞ্চিতা জানাল, সে ইংরেজিতে টেক্সট বই ভাল করে পড়ে। স্কুল থেকে যে প্রশ্নগুলি দেওয়া হয় সেগুলির উত্তর তৈরি করে। বাংলাতেও টেক্সট বই ভাল করে পড়ে ও স্কুলের দেওয়া প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে। ট্রানস্লেশন করে টেস্ট পেপার্স থেকে। গণিতে কে সি নাগের বই ছাড়াও বর্মন-দাস থেকে অঙ্ক কষে। ফিজিক্যাল সায়েন্সে সঞ্চিতা সি আর দাসের বই পড়ে, লাইফ সায়েন্সে পড়ে দাস অ্যান্ড মুখার্জির বই। ইতিহাসে পড়ে বাসু অ্যান্ড মৈত্র ও এ সি ব্যানার্জির বই। ভূগোলে পড়ে ডাঃ এস পি চ্যাটার্জির বই।

সঞ্চিতা পাক্ষিক আনন্দমেলা নিয়মিত পড়ে। কুন্তকের লেখা তার সবচেয়ে ভাল লাগে। আনন্দমেলার পুজোসংখ্যায় প্রকাশিত শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস ভাল লেগেছিল। এছাড়া সঞ্চিতার ভাল লাগে প্রধান-শিক্ষক ও ফার্স্ট বয়ের ইন্টারভিউ এবং হেড এগজামিনারের পরামর্শ।

বাঘা

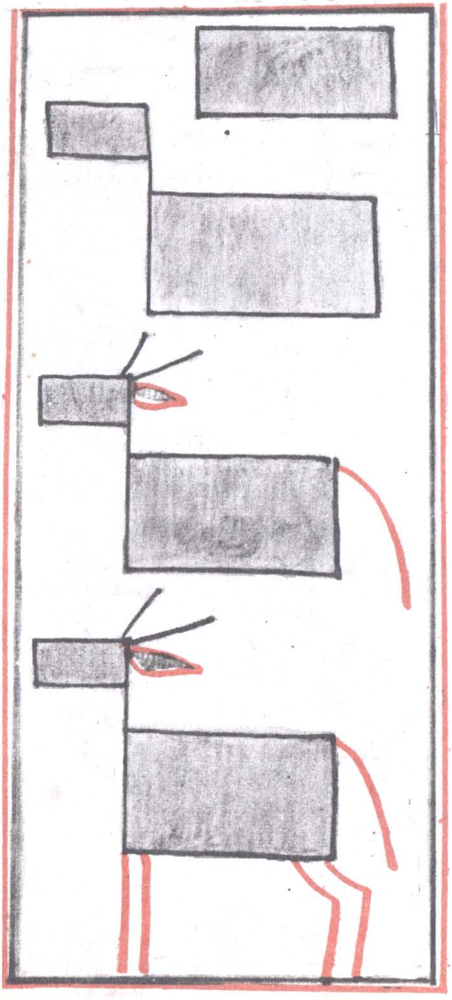



গাবলু
ফুটপাথে চিত্র-প্রদর্শনী
চওড়া নয়, লম্বাটে ছবি এবারে ভাল বিকোচ্ছে!
ওঃ, দারুণ ছবি!

জন্তু-জানোয়ার ঃ গরু ১

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে রাখবে জন্তু-জানোয়ার আঁকবার সময় বিশেষ করে নজর দিতে হবে তাদের চেহারার চরিত্রের ওপর। কী কী বিশেষত্ব নিয়ে তারা আমাদের কাছে পরিচিত। আর ঐ সব বিশেষত্ব নিয়েই জন্তু-জানোয়ারের সব কিছুই গড়ে উঠেছে। নমুনা লক্ষ করলেই বুঝতে অসুবিধে হবে না। একটি চৌকো থেকে দুটো, আর তারপর কেমনভাবে আঁকা এগিয়েছে তা নজরে রাখো।

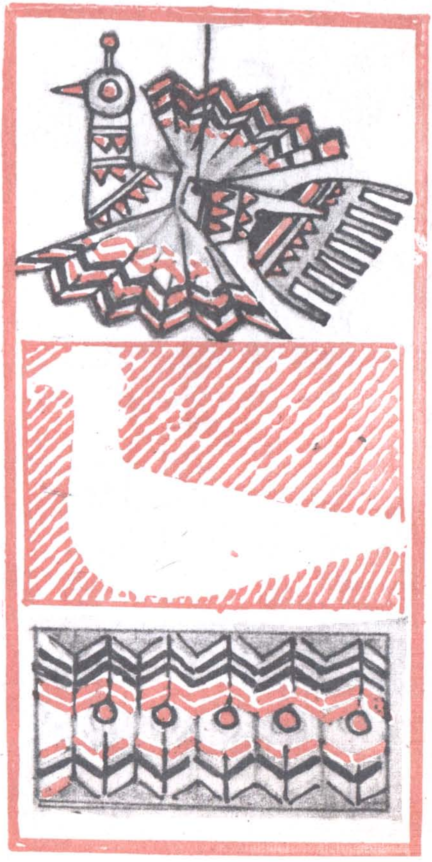


কাগজের খেলনা ঃ দোলনা পাখি ১

কারিগর

যা আছে তার সঙ্গে সুতো, পুঁতি যোগ করে শুরু করো। নমুনা-মাফিক পাখির একটা ছক বোর্ডের ওপর ফেলে তা থেকে কেটে নাও (ক-ছবি)। এবার পাখনার জন্য (খ-ছবি) লম্বা কাগজ কেটে তার ওপর নকশা করে নাও তোমার পছন্দমতো। নকশার ধরন এমন ভাবে ভাববে, যাতে কাগজকে এপিঠ-ওপিঠ করে পর পর ভাঁজ করলেও তা বেশ সুন্দর দেখায়। পরের কাগজের জন্য আসছে-বার দেখো।

জেনে রাখো ঃ ১। পাখির কাজে একটু মোটা ধরনের বোর্ড ব্যবহার করবে। ২। পাখনার জন্য পাতলা কাগজ ব্যবহার করলে ভাল।



মনে আছে কি, ছোটবেলায় যখন দাঁতের যন্ত্রনা হ'ত,
তখন ঠাকুমা লবঙ্গের তেল লাগিয়ে কেমন তা সারিয়ে তুলতেন ?
আপনার দাঁতের ডাক্তার আজও তা ব্যবহার করেন !

নতুন প্রমিস

এক অদ্বিতীয় টুথপেস্ট
যাতে আছে চিরকালের ব্যবহৃত লবঙ্গের তেল!



বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
আধুনিক সহায়ক



লবঙ্গের তেল মিশ্রিত নতুন প্রমিস টুথপেষ্ট



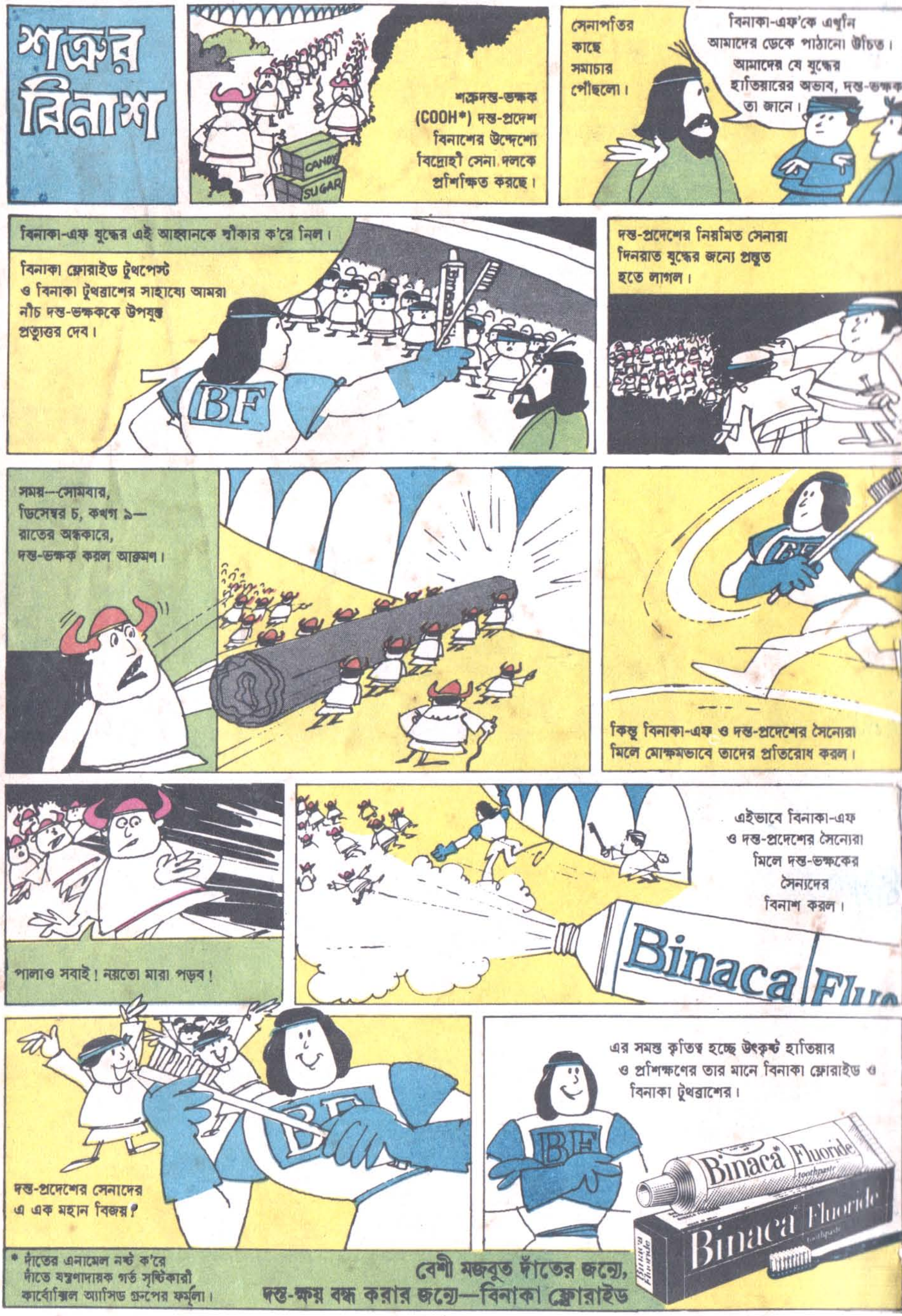
১.
দাঁতের ক্ষয়
নিবারণ করতে
সাহায্য করে।

২.
মুখের ভেতর
তাজা রাখার দরুন
নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ
হতে দেয় না।

সুস্থ সবল দাঁত ও মাড়ি
আর তাজা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে...প্রমিস!

বিশেষ প্রমিস উপহারের জন্য আপনার ডীলারের কাছে খোঁজ নিন!

CHAITRA-


শত্রুর বিনাশ
শত্রুদন্ত-ভক্ষক (COOH*) দন্ত-প্রদেশ বিনাশের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী সেনা দলকে প্রশিক্ষিত করছে।
CANDY
SUGAR
সেনাপতির কাছে সমাচার পৌঁছলো।
বিনাকা-এফ'কে এখুনি আমাদের ডেকে পাঠানো উচিত। আমাদের যে যুদ্ধের হাতিয়ারের অভাব, দন্ত-ভক্ষক তা জানে।
বিনাকা-এফ যুদ্ধের এই আহ্বানকে স্বীকার ক'রে নিল।
বিনাকা ফ্লোরাইড টুথপেস্ট ও বিনাকা টুথব্রাশের সাহায্যে আমরা নীচ দন্ত-ভক্ষককে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেব।
BF
দন্ত-প্রদেশের নিয়মিত সেনারা দিনরাত যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।
সময়—সোমবার, ডিসেম্বর চ, কখগ ৯— রাতের অন্ধকারে, দন্ত-ভক্ষক করল আক্রমণ।
কিন্তু বিনাকা-এফ ও দন্ত-প্রদেশের সৈন্যেরা মিলে মোক্ষমভাবে তাদের প্রতিরোধ করল।
পালাও সবাই! নয়তো মারা পড়ব!
এইভাবে বিনাকা-এফ ও দন্ত-প্রদেশের সৈন্যেরা মিলে দন্ত-ভক্ষকের সৈন্যদের বিনাশ করল।
Binaca Fluo
দন্ত-প্রদেশের সেনাদের এ এক মহান বিজয়!
এর সমস্ত কৃতিত্ব হচ্ছে উৎকৃষ্ট হাতিয়ার ও প্রশিক্ষণের তার মানে বিনাকা ফ্লোরাইড ও বিনাকা টুথব্রাশের।
Binaca Fluoride toothpaste
Binaca Fluoride
* দাঁতের এনামেল নষ্ট ক'রে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত সৃষ্টিকারী কার্বোক্সিল অ্যাসিড গ্রুপের ফর্মুলা।
বেশী মজবুত দাঁতের জন্যে, দন্ত-ক্ষয় বন্ধ করার জন্যে—বিনাকা ফ্লোরাইড